নবীগোপাল চক্রবর্তীর

হাসির গল্প

AKS

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
১/১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

॥ এই বইয়ে আছে ॥

গিরিধরের ইংরেজী শিক্ষা

গিরিধর পণ্ডিতের কাহিনী শুনতে হ'লে আমাদের যেতে হবে বাংলাদেশের সেই উনবিংশ শতাব্দীতে।

—"কি বুকের পাটা তোমার বৌমা, মেয়েমানুষ হয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়লে!"

বৌমা অবস্থাটা বুঝিয়ে দিয়ে বললে—"সে গাড়িটা এমন কিছু নয় মা, পাল্কির মতোই—তবে মানুষের বদলে ঘোড়ায় টানে।"

—"তা' হোক বাছা, যে মেয়েমানুষ ঘোড়ার গাড়িতে চড়তে পারে—সে তো ঘোড়ায়ও চড়তে পারে।"

এই যুগেই রেলের ইঞ্জিন দেখে পূর্বপুরুষ গলবস্ত্র হয়ে পাপ-স্খলনের জন্য কত স্তবস্তুতি করেছেন! কেরোসিন তেল দিয়ে টিনের প্রদীপ কি করে জ্বালানো হয়, দেখবার জন্য এই যুগেই পল্লীগ্রামের পুজোবাড়িতে একদিন বালবৃদ্ধের ভিড় হয়েছিল বলে শোনা যায়!

গিরিধরের ইংরেজী শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে আমি বাঙ্গালীর অজ্ঞতা বা কুসংস্কারের কথা বলছি না; এর চাইতেও বেশি অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের পরিচয় অন্য দেশের ইতিহাসেও পাওয়া যায়। নতুন একটা কিছু প্রবর্তন করতে গেলে প্রথম প্রথম তার জন্যে কতখানি বেগ পেতে হয় সেই কথাই আমি বলছি।

আজ বাংলায় কথা বলতে গিয়ে আটকিয়ে গেলে ইংরেজী শব্দ দিয়ে আমরা সহজে মনোভাব প্রকাশ করি; কিন্তু এই ইংরেজীকে আয়ত্ত করতে প্রথম প্রথম আমাদের যে কত বেগ পেতে হয়েছিল আজ কে তার সাক্ষ্য দেবে?

পার্শীবহুল বাংলা ও সংস্কৃত প্রধান বাংলা যখন বাঙ্গালীর আটপৌরে ও পোশাকী ভাষা, তখন এলো ইংরেজ। সে সব

ইতিহাসের কথা—গল্পের কথা নয়। সুতরাং ঐতিহাসিক আলোচনা বাদ দিয়ে আমরা গিরিধর পণ্ডিতের কথাই বলব।

যে যুগের বাঙ্গালী রথের ছুটি চাইতে গিয়ে সাহেবকে রথের বর্ণনা করে বলেছে, 'wood after wood—many man pull sir. Then ঘর্ঘর ঘর্ঘর !'

সেই যুগের মানুষ গিরিধর পণ্ডিত।

সাহেব গিরিধরের ইস্কুল দেখে ব'লে গেলেন—"পণ্ডিত, তোমায় ইংরেজী শিখতে হবে। আমি তোমায় একবছর সময় দিয়ে গেলাম, এর পর এলে যেন দেখতে পাই, তুমি ইংরেজী শিখেছ।"

দিন যায়। গিরিধর সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন, অধ্যাপনা করেন; কিন্তু মনের মধ্যে তাঁর একটু 'কিন্তু' থেকে যায়—একবছর পরে সাহেব এসে ইংরেজী জিজ্ঞাসা করবে।

হঠাৎ চিঠি এল—সাহেব আসছে। গিরিধর হিসাব করে দেখলেন, একবছর অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর একটি ইংরেজী শব্দও শেখা হয়নি !

অনেক খোঁজ-খবর করে গিরিধর একখানি পুরোনো ওয়ার্ড-বুক যোগাড় করলেন। এ বইখানির সুবিধা এই যে, এতে ইংরেজী শব্দগুলির উচ্চারণ বাংলাতেই দেওয়া আছে।

সময় অত্যন্ত কম। এর মধ্যে তাঁকে কতকগুলো প্রয়োজনীয় কথা শিখে নিতে হবে।

সাহেব আসতেই গিরিধর গিয়ে বললেন—"গুড্‌মর্নিং স্যার ! কাম্‌ কাম্‌। মাই হোয়াট করচুন !"

সাহেব শুনে খুব খুশি, পণ্ডিত তা'হলে ইংরেজী শিখেছে।

সাহেব ঘরে ঢুকতেই পণ্ডিত তাঁকে চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললেন —"গারলিক স্যার, গারলিক !"

সাহেব বুঝতে পারে না পণ্ডিত কি বলছে। সাহেব বসলো না। পণ্ডিত নিজেকে অপমানিত মনে করলেন।

গিরিধর চেয়ার দেখিয়ে বললেন—'গারলিক স্যার ; গারলিক !'

গিরিধর এবার রেগে বললেন—"বার বার বলছি সাহেব গারলিক, তবু তুমি—"

সাহেব বিস্মিত হয়ে বলল—"বার বার ?"

—"হ্যাঁ বার বার। আমি তোমাকে বার বার বলছি—"

সাহেব ফোঁস করে উঠল—"হোয়াট্ ?"

যাবার সময় সাহেব গিরিধরকে ধমকিয়ে আরও একবছর সময় দিয়ে বলে গেল, "এবার ইংরেজী না শিখলে কিছুতেই চাকরি থাকবে না।"

গিরিধর ইংরেজী জানা লোকেদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল— "আচ্ছা, সাহেব নিজে ইংরেজের বাচ্চা হয়েও এমন সাচ্চা ইংরেজী কথাটি বুঝল না কেন ? আমি অত করে বললাম, 'গারলিক স্যার'— তা কিছুতেই বসল না।"

ইংরেজী-নবীশ গিরিধরের ওয়ার্ড-বুক খুলে দেখালেন, গিরিধর যে শব্দটির অর্থ 'বসুন' মনে ক'রে প্রাণপণ শক্তিতে মুখস্থ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে ওটা 'রসুন' হবে। ছাপার ভুলে 'র' স্থানে 'ব' হয়ে গেছে !

ইংরেজী শেখা খুব দরকার বুঝতে পেরে গিরিধর তাঁর পৌত্র রামজয়কে কলকাতায় রেখে বিদ্যাসাগরের স্কুলে লেখা-পড়া শেখাচ্ছিলেন।

একবার গিরিধর রামজয়ের সঙ্গে বহু পথ হেঁটে এসে কলকাতাগামী রেলের গাড়িতে উঠলেন। বিশ্রামলাভান্তে তাঁর তাম্রকূট সেবনের ইচ্ছা বলবতী হ'ল ; কিন্তু আগুন পাওয়া যাবে কোথায় ? স্টেশনে নেমে গিরিধর পণ্ডিত দেখলেন—অনেকগুলো বালতি ঝুলানো রয়েছে। পণ্ডিত রামজয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—"ওর উপর সাহেবদের ভাষায় ও কি লেখা ?"

বালতিগুলোর দিকে তাকিয়ে রামজয় বলল—"লেখা রয়েছে— ফায়ার।"

—"অস্যার্থ? মানে?"

—"আগুন।"

পণ্ডিত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভাবলেন—তাই তো বলি, এত বড় বুদ্ধিমান্ যারা—যারা রেলের গাড়ি তৈরি করতে পারে, তারা যাত্রীদের সুখ-সুবিধার কথা ভাবেনি—তাদের তামাক খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা রাখেনি—এও কি কখনও সম্ভব?

তামাক সেজে হৃষ্টচিত্তে আগুনের জন্য এগিয়ে গেলেন; কিন্তু বালতিতে হাত দিয়ে পণ্ডিত তো অবাক! কারণ তিনি দেখলেন ওর সবগুলোতেই রয়েছে জল। জল দেখে গিরিধর আগুন হয়ে উঠলেন! রামজয়কে সরোষে জিজ্ঞাসা করলেন—"বালতির উপর এ লেখাগুলোর অর্থ তুমি কি বললে?"

রামজয় বলল—"আগুন।"

গিরিধর দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে বললেন—"তোমার মাথা! ওর মানে জল।"

রামজয় প্রতিবাদ করে বলল—"কি যে বলেন আপনি! আমাদের বইতে লেখা আছে, ওর মানে আগুন আর আপনি বলছেন জল!"

গিরিধর গম্ভীর হয়ে বললেন—"বইতে অনেক ভুল থাকে। ফায়ার অর্থ আগুন নয়—জল। তোমাকে কলকাতায় রেখে কতক-গুলো অর্থব্যয় আমার বৃথা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি!"

সেই গাড়িতেই গিরিধর পৌত্র রামজয়কে নিয়ে দেশে ফিরলেন।

ঘনশ্যামের চালাকী

আমি তখন ম্যাকৃওয়ার্দি কোম্পানিতে চাকরি করি। স্টোর রুমের শক্তিবাবু অত্যন্ত শক্ত লোক। ভাটিয়ালী প্যাটেল গাঁটের পয়সা কোনোদিন খরচ করে না। বড় সাহেব হচ্ছেন মিস্টার গুড—সত্যিই বড় ভাল লোক। আর তাঁর অর্ডারলি অর্থাৎ খোদ খানসামা উড়িষ্যাবাসী ঘনশ্যাম সাহু না-হু না-হু ক'রেও উভয় বাহুর সাহায্যে রোজই কিছু-না-কিছু উপরি আয় করে।

গাঁটের পয়সা খরচ না করলেও প্যাটেল কিন্তু'না খেয়েও থাকে না। একটা অ্যালুমিনিয়মের কৌটোয় ক'রে প্যাটেল খাবার আনে—এনেই সেটা জিম্মা ক'রে দেয় শক্তিপদবাবুর স্টোরে। কাজেই ঐ কৌটোর মধ্যে কোন্ বস্তু থাকে তা জানবার সুবিধা আমাদের আর ঘটে না।

গুপীবাবু একদিন চুপি চুপি ঘনশ্যামকে বলল—"এই ব্যাটা, এনে দিতে পারবি শক্তিবাবুর ফাইলের পিছন থেকে প্যাটেলের ঐ কৌটো ?"

ঘনশ্যাম হাত জোড় ক'রে বলে—"মুঁ সে পারিব না অবধড় !"

কেষ্ট মিত্তির আঙ্গুল দেখিয়ে বলল—"থ্রি অ্যানাস্ !"

ঘনশ্যাম কথা বলে না।

আমরা দলে পাঁচজন ছিলাম। রফা ক'রে বললাম—"আচ্ছা, ফাইভ অ্যানাস্—পাঁচ আনা।

ঘনশ্যাম বোধহয় রাজী হ'ল।

টিফিনের অনেক আগেই দেখা গেল, ঘনশ্যাম তার লম্বা জামার নীচে ফেলে প্যাটেলের খাবারের কৌটো নিয়ে এসেছে।

কৌটো খুলে দেখি পুলি-পিঠের মতো কি সব শক্ত খাবার। একটা কাগজে সেগুলো ঢেলে রেখে ঘনশ্যামকে বললাম—"শীগ্গির কৌটো রেখে আয়।"

কিন্তু স্টোরে তখন শক্তিবাবু উপস্থিত—সঙ্গে বড় সাহেব নিজে। ঘনশ্যাম সোজা সাহেবের ঘরে গিয়ে নিজের কাজে মন দিল।

টিফিনের সময় প্যাটেল তাঁর কৌটো খুঁজে পান না। শক্তিবাবু রেগে টং। স্টোর হ'তে চুরি! এ যে 'রাজকোষ হ'তে চুরি'র চাইতেও ভয়ানক!

ঘনশ্যাম প্যাটেলের জামার কোণে একটা সংক্ষিপ্ত টান দিয়ে তাকে বাইরে আসতে ইঙ্গিত করল। প্যাটেল বলল—"কি ?"

—"চেঁচামেচি করবেন না বাবু। সাহেবের টেবিলের নীচে তোমার কৌটো রয়েছে—বিশ্বাস না হয় দেখ গিয়ে। সাহেব নিজে তোমার ঐ খাবার খেয়ে বলেছে—'বড়া আচ্ছা চিজ হ্যায়।"

এর চাইতেও আশ্চর্য কিছু থাকতে পারে! প্যাটেল ঘনশ্যামকে জিজ্ঞাসা করল—"সাহেব খেয়েছে ?"

—"হ্যা বাবু! আর খুশি হয়ে খুব সুখ্যাতি করেছে।"

প্যাটেলের রাগ জল হয়ে গেল!

ঘনশ্যাম প্যাটেলকে বলল—"বাবু, তুমি আর একদিন খুব ভাল ক'রে খাবার এনে আমার হাতে দিও। আমি সাহেবকে টিফিনের সময় দিয়ে দেব।"

প্যাটেল তাই ভাবছিল হয়ত।

ছুটির আগে ঘনশ্যাম দুই হাতের দশটা আঙুল দেখিয়ে বলল—"বাবু, এক হাতে আর হবে না; এবার দু'হাত চাই—দশ আনা! —ফরমাস দিয়ে তৈরি করা খাবার।"

বললাম—"বহুৎ আচ্ছা, তাই দেব।"

পরদিন প্যাটেল একটা ঝক্‌ঝকে বড় কৌটোয় ক'রে ওদের দেশের কত রকম দামী খাবার ক'রে এনেছে সাহেবের জন্যে। ঘনশ্যামের হাতে দিতেই ঘনশ্যাম চট্‌ ক'রে সেটাকে ফাইলের গাদার নীচে লুকিয়ে ফেলল।

দোতালার ছাদের এক কোণে আমরা আসর ক'রে টিফিনের সময় প্যাটেলের কৌটো 'সাবাড়' করছি!

কিন্তু ঘনশ্যাম একা মানুষ, চারদিক সামলাবে কি ক'রে? হঠাৎ সেখানে প্যাটেল এসে উপস্থিত! একেবারে বমাল ধরা প'ড়ে গেলাম আমরা। প্যাটেলের মুখটা হ'ল একটা হাঁড়ির মতন! ঘনশ্যাম বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল—সমস্ত দিনের মধ্যেও সে সাহেবের ঘর থেকে বেরুল না।

পরদিনের সকালের ঘটনা। বড় সাহেব তখনও আসেননি। ঘনশ্যাম এদিকে জাতীয় ভাষায় চেঁচামেচি আরম্ভ ক'রে দিয়েছে—"তু মোরে ড্যাম-ডোম ক্যানে বলিবি! সাহেবের খাই-পরি, সাহেব কখনও আমাকে গালি দেয় না—"

ঠিক এই সময়ে অফিসের দরজায় বড় সাহেবের মোটর থামল। আমরা ভাবলাম, সর্বনাশ!

ঘনশ্যাম কিন্তু নির্বিকার। সে আগের মতোই বলতে লাগল—"তুঁ মোরে ডোম্ বলিবি ক্যানে?"

সাহেব বাঁ-হাত দিয়ে ঘনশ্যামের জামার কলার ধ'রে ফেললেন; তারপর তাকে টানতে টানতে নিজের কামরায় নিয়ে গেলেন।

সেখানে গিয়ে ঘনশ্যামের কান্না ও আস্ফালন বেড়ে গেল দ্বিগুণ! তার নালিশ—প্যাটেল তাকে রসকল, ডোম, লোয়ার বলিবে কেন?

গুড সাহেব সমস্ত শুনে বিচার করলেন: প্যাটেলের নিজের দেশের খাবার আমরা যেমন খেয়েছি, তেমনি আমাদের নিজেদের দেশের খাবারও প্যাটেলকে খাওয়াতে হবে। অবশ্য সেজন্য টাকা যা লাগল তার সব গুড সাহেব নিজেই দিলেন।

ঘনশ্যাম দু'হাত দু'পা এক জায়গায় ক'রে উল্লাসে নৃত্য করতে করতে খাবারের দোকানের উদ্দেশে রওনা হ'ল।

গেভি সাহেবের নেভি যাত্রা

কালীঘাটে মায়ের পূজো দিয়ে ফিরছিলাম। ট্রামে তখনও খুব ভিড় হয়নি। কোথায় বসব ভাবছি, এমন সময় জালার মতো মোটা এক সাহেব অত্যন্ত আপ্যায়নের সঙ্গে তার পাশে টেনে নিয়ে বসাল। সাহেব একটু-আধটু বাংলাও শিখেছে দেখলাম।

ছোট একটি চাঙারিতে মায়ের প্রসাদ ও ফুল ছিল। সাহেব জিজ্ঞাসা করল—"ও নিয়ে কি করবে ?"

বললাম—"সাহেব, এ তুমি বুঝবে না। এ হচ্ছে গডেস কালীর প্রসাদ। এতে মঙ্গল হয়।"

কিন্তু সাহেব আমার থেকেও বেশি বিশ্বাসী। বলল—"তোমাদের কালী অনেক 'মিরাকল্' জানে। আই অ্যাডমায়ার দি গডেস !"

বুঝলাম সাহেব কখনও হয়ত ঠেলায় প'ড়ে কালীবাড়ি মানত করায় ফল পেয়েছে।

ট্রামখানি জগুবাবুর বাজারের কাছে আসতে না আসতেই ভিড়ের জন্য লোকে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে আরম্ভ করল।

আমার ট্রামের ভাড়াটা কেন জানি না, সাহেব কণ্ডাকটরকে দিতে গেল। মনে মনে বুঝলাম, সীটে যে কয়জন বসবার কথা, তদনুসারে একটা মোটা মানুষ সাহেবের পাশে বসলে সাহেবের ভুঁড়ি ফেটে যাওয়ার ভয়ে আমার মতো শীর্ণকায়কে সাহেব এত আপ্যায়িত করছে।

এস্প্ল্যানেডে নামবার সময় সাহেব আমার হাতের মধ্যে একখানা কার্ড গুঁজে দিয়ে বলল—"দেখা ক'রো।"

ভাবলাম, ভালোই হ'ল—সাহেবের ঋণ পরিশোধ করবার একটা পথ পাওয়া গেল।

সাহেবের নাম গেভি। পরদিন দেখা করতে গেলে, সাহেব যত্ন ক'রে তার বৈঠকখানায় বসাল। দুঃখ ক'রে বলল—অত্যধিক মোটা

হয়ে যাওয়ার জন্যে সাহেব আজকাল কিছুই খেতে পারে না। কথা প্রসঙ্গে জানলাম, দশ বছর আগে আফ্রিকায় কোনও স্থানে রবারের চাষ করবার জন্যে মজুর খাটাতে গিয়ে সিঁদুরের ফোঁটার উপর তার কেমন একটা ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সাহেব ঘুরে ফিরে আবার সেই কথাতেই এলো—"মোটা ব'লে আমি কিছুই করতে পারি নে। মিলিটারীতে চাকরি করতাম, কিন্তু প্যারেড এবং ছুটো-ছুটি আর সহ্য হয় না। সেইজন্য মনে করেছি এবার নেভিতে যাব; কিন্তু"—এই পর্যন্ত ব'লে, গেভি চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে হতাশভাবে বলল—"খাওয়া আমার একেবারেই কমে গেছে, এভাবে জীবনধারণ ক'রে লাভই বা কি!"

এইবার সাহেব তার আসল কথায় এল—"দেখ, তোমাদের মধ্যে অনেকে এমন সব গাছ-গাছড়া ওষুধপত্র জানে, যাতে অদ্ভুত কাজ হয়। আমার এই মোটা কমাবার একটা ওষুধ দিতে পার?"

আমি বললাম—"আচ্ছা দেখব।"

—"দেখব নয়,—কালই আমি চাই, যত টাকা লাগে।" এই ব'লে গেভি আমার হাতের মধ্যে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিল।

ভালো বিপদ!

আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল রামহরি কবিরাজ। কবিরাজকে সব কথা খুলে বললাম।

কবিরাজ বলল—"ওষুধ দিচ্ছি, কিন্তু সাহেবকে ওষুধ খেয়ে দু'দিন ঘরে আটকা থাকতে হবে।"

সাহেবকে ওষুধ আর সেই সঙ্গে খানিকটা সিঁদুর দিয়ে বললাম—"কপালে এই সিঁদুর দিয়ে আর গডেস কালীকে এইভাবে গড় হয়ে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে তবে ওষুধ খাবে। যে উদ্দেশ্যে এই ওষুধ খাওয়া সেই উদ্দেশ্যের কথা মনে মনে চিন্তা করবে।"

ওষুধ খাওয়ার দ্বিতীয় দিন রাত্রি একটার সময় গেভি সাহেব আমাকে ডেকে পাঠাল।

দরজা ঠেলে ঘরে গিয়ে দেখি, গেভি তার চেয়ারে নেই—বিছানাতেও নেই। টেবিলের উপর পদস্থাপন ক'রে এবং ছাদে মাথা ঠেকিয়ে সাহেব দাঁড়িয়ে আছে!

বললাম—"সাহেব, কি খবর? কেমন আছ?"

সাহেব বলল—"ক্ষুধা হয়েছে খুব, শরীরটাও হাল্কা ঠেকছে, কিন্তু কিছুতেই নীচে নামতে পারছি না—কে যেন উপরের দিকে ঠেলে তুলছে! ছাদ না থাকলে বোধহয় আকাশের গায়ে গিয়ে ঠেকতাম!"

রামহরি কি ওষুধ দিয়েছে কে জানে!

বললাম—"সাহেব নামো।"

"নামো!"—গেভি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল—"যে ওষুধ দিয়েছ এবার আমাকে মেঘ-লোকে গিয়ে উঠতে না হয়!—এখন কি ক'রে নীচে নামব তাই বল।"

বললাম—"সাহেব, সীসে দিয়ে তোমার জুতো, মোজা, টুপী তৈরি কর, আর মোজার সঙ্গে দশ-পনের সের সীসে ঝুলিয়ে রাখ, তা হ'লেই ভারকেন্দ্র তোমাকে নীচে নিয়ে আসবে।"

আমার যুক্তিটা বোধহয় গেভির বেশ পছন্দ হ'ল। এবার একটু নরম সুরে জবাব দিল—"কিন্তু এমনটা কেন হ'ল বল তো?"

জিজ্ঞাসা করলাম—"সাহেব, ওষুধ খাওয়ার সময় তুমি কি চিন্তা করেছিলে?"

সাহেব বলল—"নেভিতে যাব, সেই কথাই তো ভেবেছি সারাক্ষণ।"

—"তবেই দেখ, ওষুধের ফল ফলেছে। নেভিতে গেলে তোমার আর ভয় নেই। জাহাজ ডুবি হোক, সাবমেরিনে ঘায়েল করুক, তুমি

কে যেন উপরের দিকে ঠেলে তুলছে

কখনও জলে ডুবে মরবে না। সীসের বোঝাটা ফেলে দিলেই তুমি আকাশে উড়তে আরম্ভ করবে!

—"হাউ ওয়াণ্ডারফুল!" ব'লে সাহেব হো-হো ক'রে হাসতে আরম্ভ করল।

বাইরে এসে শুনলাম গেভি গান ধরেছে—

"I couldn't go to navy
If I were heavy!
Now I'm light and can
Fly as a kite—রে-রে-রে!"

বুঝলাম রামহরি কবিরাজের ওষুধ ধরেছে।

রাখে কেষ্ট মারে কে ?

হারাণের ছাত্র-জীবনের কথা মনে পড়ে।

পরীক্ষার প্রশ্নে বঙ্গানুবাদ করতে দিয়েছিল, "Socrates was a great philosopher"—হারাণ বাইরে যাওয়ার ছল করে আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে গেল,—'এই, সক্রেটিস মানে কিরে ?'

আমি বললাম, 'চেতল মাছ।'

'আর এটা ?' বললাম, 'ফিলোসফার ?'

বিরক্ত হয়ে হারাণ বলল, 'উচ্চারণ দিয়ে আমার কাজ কি ? মানেটা চট্ ক'রে বল্।'

বললাম, 'ফিলোসফার মানে বোকা।'

ব্যস। আর দরকার নেই। হারাণ তার উপস্থিত বুদ্ধির জোরে লিখে গেল—চেতল মাছ খুব বোকা। ফলই মাছ-এর শিষ্য। এইসব। হারাণের এই অভিনব অনুবাদ ক্লাশের মধ্যে পড়িয়ে শুনানো হয়েছিল।

সেই হারাণ আজ ডাক্তারী পাশ করেছে।

সুদীর্ঘ তিন বছর পর-পর ফেল করে অবশেষে এইবার সে পাশ করেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁ রে হারাণ, সত্যি বল তো তুই কি ক'রে পাশ করলি !'

হারাণ বলল—'উপস্থিত বুদ্ধি রে ভাই, ওটা না থাকলে ডাক্তারী আর কাউকে পাশ করতে হয় না। এ তোমাদের আর্টস নয় যে, খানিক কবিত্ব ক'রে লিখে গেলেই পাশ।'

বললাম—'সে উপস্থিত বুদ্ধিটা তবে এতদিন খাটাসনি কেন ?'

সে বলল—'ত্রুটি করিনি, কিন্তু সব ভেস্তে গেছে—এবারও যাচ্ছিল, একটুর জন্য বেরিয়ে গেছি।'

বললাম, 'কি রকম, বল দেখি শুনি।'

হারাণ বলল, 'তবে শোন্।'

ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রাকৃটিক্যাল পরীক্ষা হয় দু'টো—একটা শর্ট কেস আর একটা লঙ্ কেস্। শর্ট কেস্-এ সময় কম। যা ইচ্ছে জিজ্ঞাসা করে। হয়ত একটা কাঁচি কি ছুরি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে —এটা কি? কি হয় এটা দিয়ে? এই সব।

এবারকার শর্ট কেস্-এ ঘরে ঢুকতেই আমায় জিজ্ঞাসা করল: Well, how many mangoes you can eat at a time? চমৎকার প্রশ্ন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম—That depends upon the size and taste of the mango, sir. পরীক্ষক বেজায় খুশি। হো হো ক'রে হেসে ফেললেন তিনি। তারপর এলো Long case. একঘণ্টা সময়। এই পরীক্ষায় বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বিভিন্ন ধরনের রোগী এনে রাখা হয়। তারপর এক একজন পরীক্ষার্থীকে খাতা দিয়ে আর নির্দিষ্ট কোনো বেড নম্বর দেখিয়ে বলা হয়,—ঐ রোগীর কি রোগ, সে রোগের লক্ষণ কি, কেন ঐ রোগ হয় এবং ঐ ব্যক্তির অসুখের প্রেস্‌ক্রিপসান-ই বা কি হবে—রোগীর বেডের কাছে বসে বসে সব লিখে দাও।

সারা বছর ধরে এই Long case-এর জন্য আমি কেবল কালাজ্বর-টাই পড়ে এসেছি। যদি পড়ে তো কেল্লা ফতে আর না পড়ে তো কুপোকাৎ।

বেড নম্বর উনপঞ্চাশ। আনলাকি নাম্বার। গেলাম দুর্গানাম স্মরণ ক'রে আর মা কালীর কাছে জোড়া পাঁঠা মানত করে। দোহাই বাবা তারকেশ্বর, কালাজ্বরের রোগীই যেন পাই।

পর্দা সরিয়ে দেখি—প্রকাণ্ড পেট, এক জল-উদরী রোগী। দেখেই তো আমার আপাদমস্তক জ্বলে গেল। রোগীর চোখের দিকে কট-মটিয়ে তাকাতে লাগলাম। সে আমার সাহেবী পোশাক, হাতে ফাউন্‌টেন পেন আর খাতা দেখে কেমন ঘাবড়ে গেল। বললাম, আমি এখানে কেন এসেছি জানো?

রোগী তখন ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকাচ্ছে। খাতাখানির উপর ফাউন্‌টেন পেনের তিনটে টোকা মেরে চোখ রাঙিয়ে বললাম—তোমার পেট কাটব।

সে বলল—দোহাই হুজুর, আমাকে ওষুধ দিয়ে ভালো করুন, পেট কাটলে আমি বাঁচব না।

বললাম—বাঁচবে না সে আমিও জানি। পেট কাটলে আবার মানুষ বাঁচে নাকি ? রোগী তখন উঠে বসেছে। দোহাই ডাক্তার বাবু এ যাত্রা আমাকে রক্ষা করুন।

বললাম—আস্তে। রক্ষা করবার মালিক আমি নই ! তোমার পেট কাটবে সাহেব ডাক্তার। খোদ বিলেত থেকে এসেছে তারা। ছুরিতে ধার দিয়ে নিয়ে আসছে এক্ষুণি।

রোগী কাঁপতে কাঁপতে উঠে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরল—লালমুখো সাহেবরা আমার কোনো কথা শুনবে না বাবু—আপনি আমাকে বাঁচান।

হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বললাম, বাঁচাবার উপায় নেই। ছুরিতে ধার দেওয়া এতক্ষণ হয়ে গেল—এক্ষুণি সাহেবরা এসে পড়বে।

রোগী কেঁদে ফেলল। বলল, আমাকে তবে ছেড়ে দিন হুজুর, আমি চলে যাই।

'চলে যাবে।—একি বাড়ি পেয়েছো নাকি ? তোমার নিজের ইচ্ছামতো কাজ হবে না এখানে। পাঁচ-পাঁচটা ইয়া মোটা সাহেব আসবে। তোমাকে চেপে ধরে এখনই ছুরি বসাবে পেটের মধ্যে।

লোকটি থর থর করে কাঁপছে তখন। গলা তার শুকিয়ে গেছে। আমার দিকে চেয়ে বলল :

—তবে উপায় ?

—বাড়ি কোথায় তোমার ?

একি বাড়ি পেয়েছ নাকি ?   চেপে ধরে এখনি ছুরি বসাবে ।

—আজ্ঞে, রাণাঘাটের কাছে। অমিবাবুরা ছিলেন আমাদের জমিদার—

—তা হ'ক। জমিদারে এখন আর তোমায় বাঁচাতে পারবে না—বাঁচবার একমাত্র উপায় আছে যদি পালাও। কোন্ হাসপাতাল থেকে এসেছ ?

—আজ্ঞে শিবনাথ—

তাহ'লে আরও মুশকিল। তোমাকে কলকাতা ছাড়তে হবে। পথে পেলেই তোমাকে আবার ধরে নিয়ে আসবে এখানে আর এনেই পাকড়ে ধরে ছুরি বসাবে তোমার ঐ পেটের মধ্যে।

—কি করে পালাব হুজুর, হাতে যে একটা পয়সাও নেই—

পকেটে টাকা ছিল। দশটা টাকা ফেলে দিয়ে বললাম, রিক্সা ডেকে এখনই তোমায় তুলে দিচ্ছি—সোজা শিয়ালদা গিয়ে রাণাঘাটের টিকিট কেটে যে গাড়ি সামনে পাও—তাতেই উঠে বসবে। সাবধান, এক মুহূর্তও দেরি করেছ কি অমনি এরা ধরে নিয়ে আসবে।

তিন-তিন বার গাড্ডু মেরে মরিয়া হয়ে গিয়েছি তখন। যা থাকে কপালে—লুকিয়ে পায়খানার দরজা দিয়ে এক রিক্সাওয়ালার সাহায্যে রোগীকে চালান করে দিলাম। তারপর খাতা নিয়ে বসলাম কালাজ্বরের ইতিহাস আর তার চিকিৎসার কথা লিখতে।

যথারীতি খাতা দাখিল করার পর পরীক্ষক এলেন রোগীর সঙ্গে খাতা মিলিয়ে নিতে—What's that! where's the patient ?

আমি একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

—I do not know sir, I found him here on the bed just a few minutes before.

মেথর ভয়ে ভয়ে বলল, 'বোধহয় টাট্টি ফিরতে পায়খানা গিয়েছে।'

কিন্তু সেখানেও রোগী নেই। সর্বনাশ! খোঁজ—খোঁজ, কিন্তু রোগীর টিকিও দেখা গেল না কোথায়ও!

পরীক্ষক আমাকে ডেকে চুপি চুপি বললেন—ছাখো, তোমার খাতা দেখেই আমি নম্বর দিয়ে দিচ্ছি; কিন্তু খবরদার রোগীর এই ব্যাপার নিয়ে আর উচ্চবাচ্য ক'রো না।

বললাম, রামঃ, তা কখনও করি। রোগীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধই বা কি!

—তারপর গেজেটে যথারীতি আমার নাম বেরিয়ে গেল।

বললাম, 'তা তো গেল, এইবার সেই রোগীটার একটু খোঁজ কর। বেচারা মরে গেল না বেঁচে থাকল ছাখ্।'

হারাণ বলল. 'গিয়েছিলাম আনুলে। রাণাঘাট নেমে ঘাটগাছার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি—দূরে একটা লোক গরু চরাচ্ছিল, আমাকে দেখেই ছুটতে ছুটতে গিয়ে উঠল এক তেঁতুল গাছে। ভাবলাম, লোকটা পাগল নাকি? ব্যাপার কি? সেই তেঁতুলগাছের দিকে এগুতেই লোকটি চিৎকার জুড়ে দিল—ওগো পিসিমা গো, সেই পেট কাটা ডাক্তার এসেছে, আমায় এক্ষুণি ধরে নিয়ে যাবে।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম,—সেই জল-উদরী রোগীই বটে। তবে জল তার উদরে বেশি নেই, ছুরি বসাবার ভয়েই তার পেট চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে।

জুরীর বিচার

দারুণ গ্রীষ্মে রাত্রে প্রাণহরিবাবুর একটুও ঘুম হয়নি। ভোরের দিকে তাঁর একটু তন্দ্রা এসেছিল, কিন্তু স্ত্রীর চপেটাঘাত শব্দে তাও ভেঙে গেল।

তোমরা কিন্তু মনে কোর না যে, প্রাণহরিবাবুকে তাঁর স্ত্রী করতল-পৃষ্ঠের আঘাতে ঘুম থেকে উঠিয়ে দেন! আসলে তিনি মশা মারছিলেন। মশারীর মধ্যে যে সব মশা আটকা পড়ে গিয়েছে দুইটি করতল-পৃষ্ঠ দ্বারা হুঙ্কার শব্দে তিনি তাদেরই প্রাণ সংহারে ব্যস্ত ছিলেন।

প্রাণহরিবাবু তাঁর মেদবহুল দেহ নিয়ে সেই হত্যাকাণ্ড দেখছিলেন।

হঠাৎ তিনি সন্ত্রস্তভাবে উঠে বসলেন। বললেন: হত্যাকারীর শাস্তি কি জান?—প্রাণদণ্ড, ফাঁসি।

: ও! তুমি বুঝি আজ আবার জজ-সাহেব—জুরী হবে! আচ্ছা, যার বিচার করবে সে কিসের আসামী?

: কি জানি, আগে থেকে তা কি ওরা জানায়? প্রাণহরি গম্ভীর হয়ে বললে: খুনী ডাকাতের আসামীই হবে বোধহয়!

: খুনী!—তা'হলে তো গুণ্ডা!—না বাপু—তুমি ওর বিচার করতে যেও না।

প্রাণহরিবাবু আরও গম্ভীর হয়ে বললেন: যেতেই হবে। সরকারী—গবর্নমেণ্টের হুকুম। না গেলে রক্ষা আছে—হাকিম নড়ে কিন্তু হুকুম নড়ে না।

প্রাণহরিবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন: তুমি ওর ফাঁসি দেবে?

হাকিমি সুরে প্রাণহরিবাবু উত্তর দিলেন: দিতেও পারি—নাও পারি—একটা কলমের খোঁচার উপর সবই নির্ভর করছে।

স্বামীর ক্ষমতার কথা শুনে স্ত্রী বিস্ময়-বিমুগ্ধ নয়নে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

প্রাণহরিবাবু শহরে যাচ্ছেন জুরী হয়ে আজ। শহর থেকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস এই সময়ে আনিয়ে নেওয়া দরকার। প্রাণহরিবাবুর স্ত্রী তাঁকে বললেন: শোনো, বাড়ি আসার সময় বালিশের খেরো আনবে আট গজ। অয়েল ক্লথ একখানা। আয়না একখানা আর মাথায় দেওয়া জাল একটা—এ কিন্তু চাই—ভুললে চলবে না।

পেনসন প্রাপ্ত পোস্টমাস্টার অম্বিকা দত্ত হুঁকো টানতে টানতে এসে বললেন: ভায়া, শহরে যখন যাচ্ছ কিছু চা নিয়ে এসো। এই গাঁয়ের দোকানের চা—ছো:! এরা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড চা ছিবড়ে শুকিয়ে বিক্রী করে।

কেশব মিস্ত্রি নমস্কার জানিয়ে একটা টাকা রেখে বলে গেল: কত্তা, ফিরবার সময় আমার জন্যে এক শিশি 'লোহার পিল' নিয়ে আসবেন—মেয়েটা বড়ই বদ হজমে ভুগছে।

দেড়টায় ট্রেন। প্রাণহরিবাবু খেতে বসেছেন। বড় মেয়ে অতসী এসে বায়না ধরল: বাবা, আমার জন্যে একখানা জীবনবালার বই। তার মধ্যে কত গান আছে, সেই বই একখানা। রেখার ছোট মাসী এনেছিল, তার কাছে দেখলাম কেমন সুন্দর সব ছবি—কত গান। আনবে কিন্তু বাবা।

প্রাণহরিবাবু বললেন: হুঁ।

ছোট ছেলে বাবলু বলল: বাবা, বল। কে যেন তাকে কথাটি শিখিয়ে দিয়েছে।

প্রাণহরিবাবু হাসলেন: আচ্ছা, বল আর বিস্কুট।

সেজ মেয়ে দীপু এতক্ষণে সাহস পেয়ে বলল: বাবা, আমার জন্য আলতা—

: কেন, আলতা নেই নাকি ঘরে! প্রাণহরিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

: ও নয়। দীপু আপত্তি জানিয়ে বলল।

: তবে কি!

: ঐ যে নখে দেয়—রেখার মাসী লিলি ঠোঁটে দিয়েছিল, সেই আলতা।

প্রাণহরিবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন : হুঁ।

ছেলেবেলা থেকেই দুপুরে একবার গা গড়াগড়ি দিবার অভ্যাস প্রাণহরিবাবুর প্রবল ; কিন্তু উপায় নেই—ফাঁসির আসামী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে—অথচ ট্রেন যেন তাকে না নিয়েই চলে যাবে বোধ হচ্ছে! তার উপর ও পাড়ার বিন্দীর পিসী এসে ধন্না দিয়েছে—তার নাতনীর জন্য শহর থেকে একটা গিল্‌টি করা কানপাশা আনতেই হবে।

ট্রেনেও প্রচণ্ড ভিড়। দুপুর বেলায় চিরাভ্যস্ত নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় প্রাণহরিবাবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

শহরে যখন ট্রেন থামল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। মফঃস্বল শহর। প্রাণহরিবাবু অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে একটা ছোট-খাট হোটেলে গিয়ে উঠলেন। একটু সকাল সকালই তাঁর ঘুমোবার ইচ্ছা—কিন্তু বিধাতা বিমুখ। বিছানা করতে গিয়ে প্রাণহরি দেখলেন—তাড়াতাড়িতে মশারিটি ভুলে ফেলে এসেছেন।

সমস্ত রাত্রি মশার কামড়ে তাঁর একটুও ঘুম হ'ল না।

পরদিন দশটায় প্রাণহরি নিদ্রালস চোখে কোর্টে চললেন। জজ-সাহেব, উকিল-মোক্তার, আসামী, সাক্ষী, জুরী সবগুলো মিলে প্রাণহরির কাছে যেন কোনোও ছায়াছবির মতো মনে হ'তে লাগল। প্রাণহরি জুরীদের মধ্যে বসলেন। জজ-সাহেব কেসটি বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর কোনো কথা প্রাণহরির কানে গেল—কোনো কথা বা গেল না। নিদ্রাকাতর চোখে সকলই যেন তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো মনে হ'তে লাগল।

জজ-সাহেব জুরীকে বুঝিয়ে দিলেন: খুনী মামলার বিচারে প্রথম কথাই মনে রাখতে হবে,—দোষী যে, সে খালাস পাক ক্ষতি নেই, কিন্তু নির্দোষ যেন শাস্তি না পায়।

প্রাণহরিবাবুরও সেই মত। 'নট্ গিল্টি' বলে দিলেই তো সব গোলমাল মিটে যায়।

কিন্তু সন্ধ্যা অবধি বিচার করেও সেদিন মামলা শেষ হ'ল না। আর আর জুরীরা বেশ ধীরে-সুস্থে পাঁচদিন বসে মোকদ্দমা মিটাতে চান—কিন্তু প্রাণহরিবাবুর প্রাণ মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আরও একটা বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হ'ল।

পরদিন কোর্টে গিয়ে প্রাণহরিবাবু শুনলেন, জজ-সাহেব বলেছেন, আজই মোকদ্দমার রায় দিতে হবে।

প্রাণহরিবাবু দেখলেন—সন্ধ্যা সাতটায় একটা ট্রেন আছে; ঐ ট্রেনটা ধরতে পারলে আর রাত্রিবাসের কষ্ট ভোগ করতে হয় না! ছু'দিনেই তাঁর শরীর একেবারে আধখানা হয়ে গিয়েছে।

জজ-সাহেব জুরীদের সম্বোধন করে বললেন: আপনারা কাগজ আর পেনসিল নিন। আসামীর স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যে সব পয়েন্টস আছে তা লিখুন—তারপর বিচার করুন—আসামী অপরাধী কি না। জুরীদের কাগজ পেন্সিল দেওয়া হ'ল। জজসাহেব বললেন: আপনারা একমত হতে চেষ্টা করুন।

ফোরম্যান চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন করেন। কেউ বলে 'গিল্টি' কেউ বলে 'নট গিল্টি'। গিল্টির কথায় প্রাণহরির বিন্দী পিসীর কানের তুলের কথা মনে পড়ল, আর মনে পড়ল অম্বিকা দত্তের চা, কেশব মিস্ত্রির লিভার পিল। তাঁর স্ত্রীর ফরমায়েশের কথাও সঙ্গে সঙ্গে উঠল। প্রাণহরিবাবু ভাবলেন, সময় সংক্ষেপ—একটা ফর্দ করা যাক।

সমস্ত কোর্টে লোকারণ্য। সকলেই যেন একটা আসন্ন মৃত্যু-সংবাদের জন্য দম বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচটার সময় জজ

সাহেব রায় দিয়ে কাছারী বন্ধ করবেন। ফোরম্যান জুরীর ব্যক্তিগত লিখিত মত এবং সমষ্টিগত মন্তব্য দাখিল করলেন। উদ্‌গ্রীব জনসাধারণের সামনে জজ-সাহেব সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়ে জুরীদের মন্তব্য পাঠ করতে উঠলেন—'জীবনবালার ছবি—কানপাশা—ঠোঁটের লাল আলতা'—

ঝোঁকের উপর এক নিঃশ্বাসে এতখানি পড়ে ফেলে জজ-সাহেব থমকিয়ে গেলেন।

সে যাত্রা আসামীর ফাঁসি হয়েছিল—না, সে বেকসুর খালাস পেয়েছিল এ সংবাদ আমরা জানতে পারিনি !

বিস্মরণীয়

পিসেমশায় যখন হাঁকডাক দিয়ে কেষ্টাকে উপস্থিত করলেন আমাদের জিনিসপত্তর গাড়িতে তুলে দিতে, অবিনাশ তখন রীতিমতো মুখ ফিরিয়ে বসেছে। তা এমন হয়; একটা জটিল পরিস্থিতি কাউকে গম্ভীর ও বিষণ্ণ করে আবার কাউকে করে ভাবাকুল। তা নইলে ঠিক সেই সময়েই নন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করত না—

'ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর,
যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর।'

অবিনাশ যেন আরও বিরক্ত! বলে: এই গাড়োয়ান, চালাও—

আশ্চর্য হয়ে যাই, হঠাৎ অবিনাশের এই ভাবান্তর হ'ল কেন? জিজ্ঞাসা ক'রে বসি পথের মাঝে: তোর হ'ল কিরে অবিনাশ?

অবিনাশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে: দেখ, কেউ কেউ আছে যার নাম করলে অযাত্রা হয়। ওদের ঐ কেষ্টা নামটা শুনে আমাদের গাঁয়ের ভুলো কেষ্টার কথা মনে পড়ল! তার নাম যদি কেউ করেছ, আর রক্ষা নেই!—আমাকে ভুলে পেয়ে বসবে। তখন একাশী লিখতে আঠার লিখবে, দু'টাকা তিন আনা দিতে গিয়ে তিন টাকা দু'আনা দেবে। আমি তো ভাই একদিন শিয়ালদা থেকে রাণাঘাটে বন্ধু গোবিন্দ চক্রবর্তীর কাছে যেতে উপস্থিত হয়েছিলাম সোনারপুর রণেন মিত্তিরের বাসায়। অবশ্য যত্ন করেছিল তারা স্বামী-স্ত্রীতে খুবই। চপ, মামলেট, গরম সিঙ্গারা, চা এইসব খাইয়ে, কিন্তু তবু কোথায় যেতে ভুলে কোথায় চলে গেলাম দেখ!

সাধন বলল: এই কথা! তবে শোন্—আমাদের গাঁয়ে ছিল বাঁকাশ্যাম—অবিশ্যি তার নামই বাঁকাশ্যাম নয়, শুধু শ্যাম, কিন্তু আমরা তাকে বলতাম বাঁকাশ্যাম—

নন্তু টিপ্পনি কেটে বলল : আরে শ্যাম তো চিরকালই বাঁকা—'শ্যাম তুমি বাঁকা, বাঁকা তোমার মন'—গানের সুরে বক্তব্যটাকে আরও জোরালো করে নন্তু।

: সে শ্যাম তো ছিল নিজে বাঁকা আর আমাদের গাঁয়ের শ্যাম বাঁকা করত অপরকে। উত্তর দেয় সাধন।

: কি রকম ?

: সে এক অদ্ভুত চিড়িয়া। পথে বেরিয়েছ, দেখা হ'ল বাঁকাশ্যামের সঙ্গে—অমনি বুঝবে তোমার কপালে দুঃখ আছে। পেন্সিল, কলম, চিরুণী যাই থাক না কেন, বাড়ি এসে দেখবে সেটা বাঁকা হয়ে গেছে। সেবার রথের বাজারে যাওয়ার পথে দেখা হ'ল বাঁকাশ্যামের সঙ্গে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম কেনা-কাটা আজ আর করব না ; কিন্তু যে গরম, একটা শীতলপাটি, একখানা পাখা আর একটা জলের কুঁজো নিয়ে বাড়ি এলাম। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই পিসিমা তেড়ে এলেন : চোখ দিয়ে দেখে আনিসনি পাখা ?—এ যে বাঁকা ত্রিভঙ্গ! এতে কখনও হাওয়া হয়!

রমা বাড়ির ঝি। কুঁজোটায় জল ভরতে গিয়ে সে হেসেই খুন!

: মা দেখো, কুঁজোর চেহারা, ঘাড় কাৎ করে রয়েছে যেন!

ছোট বোন তপতী বলল : গালে চড় মেরে পয়সা নিয়েছে লোকটা। এমন বাঁকা কুঁজো কেউ কখনও কেনে!

খাওয়া-দাওয়ার পর পাশের ঘরের খাটে শীতল পাটিটা পাতা নিয়ে দস্তুর মতো মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে দেখা গেল। একদিক্ সমান করলে অন্য দিক্ থাকে বেঁকে! ওঃ! সেদিন কি কুক্ষণেই মেলায় গিয়েছিলাম রে ভাই!

এর পর আমাকেও কিছু বলতে হয়। বললাম : এতেই ঘাবড়ে যাচ্ছ? তবে শোনো। আমাদের পাড়ার কাটা নন্দীর কথা শোনো।

গাড়ির বাইরের দিকে তাকিয়ে বললাম : এটা মোটর গাড়ি নয় —ঘোড়ার গাড়ি তাই রক্ষে—নইলে ফাটা নন্দীর নাম করলে এতক্ষণ —হ্যাঁ যা বলছিলাম, যাচ্ছ সাইকেলে, দেখা হ'ল ফাটা নন্দীর সঙ্গে। বেশি দূর নয়, দু'চার মিনিটের মধ্যেই দেখবে তোমার চাকা বার্স্ট করেছে! ঐ যে কুঁজোর কথা বললি, ফাটা নন্দীর নাম করলে ওতে আর জল রাখতে হ'ত না। খাওয়ার আগে লোকে তার নাম করে না—ভাতের হাঁড়ি ফেটে যাবে বলে। একবার ম্যাচ খেলতে গিয়ে ফাটা নন্দীর সঙ্গে দেখা—বললে প্রত্যয় যাবে না, পাঁচ নম্বর বলটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল একটা শট্ মারতেই!

: বাঁয়ে শিয়াল গেলে নাকি—বলতে যায় নন্তু।

: শিয়াল! বাঘ গেলেও রক্ষা নেই ফাটা নন্দীর কাছে!

: আমাদের উকিল—প্রভাস গাঙ্গুলীকে তো চিনিস, ভয়ানক নাস্তিক—ওসব সে মানেই না। সেবার যাছু পেয়েছিলেন টেরটা—

: কি হয়েছিল রে? জিজ্ঞাসা করে অবিনাশ।

কলকাতায় জরুরী কাজ। ছুটেছেন মোটর হাঁকিয়ে। দেখা হ'ল ফাটা নন্দীর সঙ্গে। ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে নিলে কি হয়, মাঝ পথে মোটরের টায়ার বার্স্ট।

: পচা টায়ার গাড়িতে লাগালে তো এমনিই ফাটে—টিপ্পনি কাটে নন্তু।

: পচা টায়ার! হুঁ! তারপর ছুটতে ছুটতে ইস্টিশনে গিয়ে প্রভাসবাবু পেলেন একখানা ট্রেন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন যেন। কিন্তু গোটা কয়েক স্টেশন তারপরই মাঝপথে এঞ্জিনের বয়লার বার্স্ট।

: অ্যাঁ!

: কেন? বল্ পচা এঞ্জিন!—কার ক্ষমতা বেশি বল্‌তো? বিজয় গর্বে জিজ্ঞাসা করে ওদের দুজনকে।

: বাবু?

: কি রে?

: গাড়ি চলে গেছে অনেকক্ষণ। ওরা বলছে দেড় ঘণ্টা আগে।

নন্তু প্রতিবাদ করে বলে : কেন, আমি যে টাইম টেবলে দেখলাম একটা ছত্রিশ ?

রাস্তার ভদ্রলোক একজন বললেন : সে ছিল আগে। নতুন টাইম টেবলে সময় পাল্টে গেছে। আপনি পুরনো টাইম্ টেবল দেখেছেন ভুলে।

: কার ক্ষমতা বেশি !—উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল।

সাগরেদ

অবিনাশ আমার সহপাঠী বন্ধু। বাপের একমাত্র ছেলে সে; বিষয়-সম্পত্তিও আছে। কিন্তু অবিনাশ চিরদিনই একটু খেয়ালী। খেয়ালী বলেই পিতার মৃত্যুর পর সে চাকরি-বাকরি কিছু করেনি। না ক'রে ভালোই করেছে,—কারণ চাকরিতে যে কি সুখ তা' আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।

তবু আমাদের সান্ত্বনা ঐ অবিনাশ। অফিসের ছুটির পর সন্ধ্যার দিকে হাত-পা ছড়িয়ে যদি কোথায়ও বিশ্রাম করবার জায়গা থাকে তো সে অবিনাশের বৈঠকখানা। রেডিও, তাস, চা এবং গল্প-গুজবে সারাটা সন্ধ্যা আমরা কাটিয়ে দেই অবিনাশের ওখানেই। এক কথায় বলতে গেলে অবিনাশের জন্যই আমরা বেঁচে আছি।

সেদিন ঘরে ঢুকেই দেখি, একটা এস্রাজ নিয়ে অবিনাশ পিড়িং পিড়িং করছে। ভালো উৎপাত! সারা জীবন বল খেলে, মড়া পুড়িয়ে আর মারামারি ক'রে যার দিন কাটল—এসব তারের যন্ত্রে তার হাত দেওয়াই বা কেন?

আমরা রোজ আসি, কিন্তু আসর আর জমে না। এর উপর আর এক উপসর্গ এসে জুটেছে। অবিনাশ কোথা থেকে এক দাঁড়িওয়ালা খাঁ-সাহেবকে যোগাড় করেছে—ইন্দোর না লক্ষ্ণৌ তার বাড়ি। অবিনাশ বলে: সে নাকি দানেশ খাঁর ভায়রা-ভাই গণেশ খাঁ না কে—খুব মস্ত একজন বাজিয়ে। সে এই ওস্তাদজীকে তার বাইরের ঘরে আস্তানা ক'রে দিয়েছে। প্রত্যহ এই ওস্তাদের জন্য কাবাব-চিনি, দুধ, সিদ্ধির শরবৎ এবং আরও কত কি সব যোগাড় করতে হচ্ছে!

চার-পাঁচদিন হ'ল ওস্তাদজী অধিষ্ঠান করেছেন, এ পর্যন্ত তাঁর হাতের বাজনা কিন্তু কেউই শুনতে পায়নি! বাজাতে অনুরোধ জানালেই তিনি বলেন: মেজাজ নেহি আয়া!

আমরা সন্ধ্যার দিকে ঘন্টার পর ঘণ্টা ওস্তাদজীর 'মেজাজ' আসবার অপেক্ষায় ব'সে থাকি, কিন্তু মেজাজ আর আসে না। অবশেষে ওস্তাদের মেজাজ না আসবার জন্য আমাদের মেজাজই বিগ্‌ড়িয়ে গেল। এদিকে ওস্তাদ চুপ থাকলেও সাগরেদের কিন্তু বিরাম নেই। অবিনাশ নিরন্তর পিড়িং পিড়িং ক'রেই চলেছে—প্রাণখুলে দুটো কথা যে বলব তারও উপায় নেই।

সেদিন ছিল রবিবার। ছুটির দিন। গ্রীষ্মকাল। ভাবলাম, নদীতে একটা ডুব দিয়ে আসি। খেয়াঘাটে গিয়ে দেখি, লম্বা বাক্সের মতো একটি পদার্থ বালির উপর রয়েছে। এক সাধু কচুপাতায় ফুল রেখে সেই বাক্সটাকে পুজো করছে।

নিদাঘের মধ্যাহ্ন-সূর্য মাথার উপর খাঁ-খাঁ করছিল, তবু ব্যাপারটা জানবার জন্য আগ্রহ হ'ল। বাক্সের পাশে—একেবারে ধুলোর উপর ব'সে জিজ্ঞাসা করলাম: বাবাজীর কি পুজো হচ্ছে?

প্রথমটা সাধু কোনোও কথা বলল না। শেষে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল: মনের পুজো।

যেন ভাবে গদ্‌গদ হয়ে বললাম: অহো! কি সুন্দর! পুতুল পুজোর কি ফল রে তোর মনের পুজো কর।

সাধু বললেন: বাঃ, বাবা খুব সমঝদার লোক তো!

বললাম: এইবার ব'লে ফেলুন তো বাবাজী, কি আছে ওর মধ্যে।

সাধু বলল: তারের যন্ত্র। যেখানেই যাই, সঙ্গে না নিয়ে পারিনে।

বললাম: পারার উপায় আছে বাবাজী? কথায় বলে, 'যার যেখানে আকর্ষণ, তার সেখানে পাবে মন।'

সাধু বললেন বাঃ বাঃ! বাবার বুঝি এদিকে—

হাত জোড় ক'রে আকাশের দিকে একটা নমস্কার জানিয়ে বললাম: ওস্তাদজীর আশীর্বাদে কিছু কিছু—

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন ঃ 'জরুর আয়া'

সাধু একেবারে আমার পায়ের উপর পড়ে আর কি! বলেঃ ওস্তাদের খোঁজেই ঘুরে বেড়াচ্ছি বাবা!

বুঝলাম একেও আমাদের অবিনাশের রোগে পেয়েছে। মনে মনে ভাবলাম, চাণক্য বলেছেন 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'—অবিনাশের ভূত একে দিয়েই ঝাড়ানো যায় কিনা দেখা যাক্। বললামঃ আছে, ওস্তাদ আছে—খুব বড় ওস্তাদ। কিন্তু ধাপে ধাপে উঠতে হবে।

ঃ আগে ওস্তাদের বড় শিষ্যের কাছে গিয়ে সাগরেদ হ'তে হবে। গুণ থাকলেই ধরতে পারবে তাকে।

সাধুর ইচ্ছা সেই জায়গায় তখনই আমাকে এক হাত শুনিয়ে দেয়!

বললামঃ থাক। ওস্তাদ আর শিষ্য এক জায়গাতেই আছে, তাদের খবর দিচ্ছি। শিষ্যকে যদি ধরতে পার, ওস্তাদ আপনিই ধরা দেবেন—তবে আঁকড়ে থাকা চাই।

সাধু বলল: তা হ'লে আপনার সঙ্গেই—

বাধা দিয়ে বললামঃ উঁহু। তুমি বলবে দৈবাদেশে গুরুর সন্ধান পেয়ে ছুটে এলাম। লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে, এখনই চলে যাও সতেরো নম্বর হরিদাস পাল লেনের অবিনাশ বাঁড়ুজ্যের বাড়ি। পথ দেখিয়ে দিয়ে আবার বললামঃ ঝুনো নারকেল দেখেছ তো বাবাজী? ঝুনো নারকেলের উপরে খোসা, কিন্তু ভেতরে মিষ্টি জল। গুণীর সঙ্গও তাই। নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকলেই তবে জিনিস পাবে।

সন্ধ্যায় অবিনাশের বাইরের ঘরে গিয়ে দেখি, নতুন সাগরেদ নিরন্তর নানাবিধ গৎ বাজিয়ে চলেছে। অবিনাশ গালে হাত দিয়ে ব'সে আছে, আর ইন্দোরের সেই দাঁড়িওয়ালা ওস্তাদজী একপাশে হাত-পা গুটিয়ে তিরিক্ষি মেজাজে নতুন সাগরেদের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে।

আমাদের দেখে অন্যদিন অবিনাশ কথা বলে না, আজ বলল : আয়।

বললাম : তোর যন্ত্র ধরিস্‌নি এখনও ?

অবিনাশ বলল : চুপ।

তারপর সে নাছোড়বান্দা নতুন সাগরেদের সংবাদ ব'লে আমাকে জানাল : পিসিমা চটে গেছেন। তিনি আর কারও ভাত রাঁধতে পারবেন না। এদিকে ও লোকটি আঠার মতো লেগে আছে আর সারাটা দিন পিড়িং পিড়িং ঘ্যানর ঘ্যানর বাজনা কাঁহাতক বরদাস্ত হয় বল্‌ তো! ওস্তাদজী তো একেবারে ফায়ার হয়ে উঠেছেন!

নতুন সাগরেদ আমাকে চিনতে পেরেছিল কিনা জানি না। নবাগতের দল দেখে বোধহয় তার বাজনায় উৎসাহ আরও বেড়ে গেল; খোদ ওস্তাদের কাছে গিয়ে মাটিতে ব'সে সে মস্তক আন্দোলনপূর্বক গৎ বাজাতে আরম্ভ করল; এমনি গৎ যে, তা শুনে ঘুমন্ত মানুষেরও চমকে উঠবার কথা!

খানিক পরে দেখি ওস্তাদজী তাঁর নিজের যন্ত্রটি তুলে ধরলেন। দেখে আমরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম : মেজাজ আয়া ?

ওস্তাদ তাঁর তল্পিতল্পা তুলে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন : জরুর আয়া! তারপর হন হন ক'রে রাস্তায় গিয়ে নামলেন।

আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

উল্টো ফল

ইংরেজ আমলের কথা।

মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এক খোদ বিলিতি সাহেব। তাঁর ইচ্ছা, কম বয়সে যে খুব লম্বা এবং মিলিটারীতে যে কাজ করেছে এমন লোককেই তিনি 'হাজারদুয়ারী'র প্রহরীর কাজে নিযুক্ত করবেন।

কিন্তু তেমন লোক আর পাওয়া যায় না। কত লোক আসে আর ফিরে যায়। অবশেষে সাহেব ঘোষণা করলেন, এমন লোক যে এনে দিতে পারবে তাকে তিনি পুরস্কার দেবেন।

এক গোলন্দাজ সাহেবকে পাকড়াও করল কয়েকজন লোক: সাহেব, তোমাকে নবাব প্যালেসে হাজারদুয়ারীর চাকরি ক'রে দেব চল। সাহেব এদেশের ভাষা জানে না, ইংরেজীও জানে না। সে যেতে নারাজ।

এর আগে যারা এসেছিল ম্যাজিস্ট্রেট তাদের কয়েকটি বাঁধাধরা প্রশ্ন করেন, যেমন—

How old are you ? (তোমার বয়স কত ?)

How long you were in the military service ? (তুমি কতদিন মিলিটারীতে চাকরি করেছ ?)

What do you like—a civil or a military post ? (তুমি কোন্ চাকরি পছন্দ কর—সাধারণ না সৈন্য বিভাগ ?)

লোকগুলিও নাছোড়বান্দা। তারা ঐ গোলন্দাজ সাহেবকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে দিল,—মাত্র তিনটি ইংরেজী কথা মুখস্থ করলেই তার চাকরি অনিবার্য।

ম্যাজিস্ট্রেট যখন জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার বয়স কত ?

সে উত্তর দেবে পঁচিশ বছর (Twenty five years.)।

কতদিন সে মিলিটারীতে ছিল—উত্তর দেবে পাঁচ বছর (five

years.)। সে কোন্ চাকরি পছন্দ করে জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে ছুটোই (both.)।

গোলন্দাজ সাহেব পাঁচদিন ধরে মুখস্থ করল—ঐ তিনটি কথা : Twenty five years, Five years, Both.

কিন্তু সাক্ষাতের সময় ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্ন কয়টি একটু ওলট-পালট হয়ে গেল।

তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন : কতদিন তুমি মিলিটারীতে ছিলে ?

লোকটি মুখস্থ মত উত্তর দিল : Twenty five years.

ম্যাজিস্ট্রেট ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন : তোমার বয়স কত ?

সে উত্তর দিল : Five years.

ম্যাজিস্ট্রেট রেগে-মেগে জিজ্ঞাসা করলেন : Am I a mad or are you a mad ? (তুমি পাগল না আমি ?)

লোকটি নির্বিকারচিত্তে উত্তর দিল : Both. (উভয়েই)।

বলরাম দাশের দরখাস্ত

সাহেবের পিওন বলাই ওরফে বলরাম দাশ প্রত্যহ এগারোটায় এখানে এসে আমাদের আফিসের টাইপ-রাইটার কলটি নিয়ে যখন তখন খটাখট করে। এইভাবে সে আজ দু'বৎসর ধরে করছে। কলটির পরমায়ু যেমন কমেছে, বলাইয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তেমনি বেড়ে গেছে চতুর্গুণ। বলাইয়ের ধারণা, সে একজন উঁচুদরের টাইপিস্ট—সামান্য পনের টাকা মাইনে তার পক্ষে লজ্জার বিষয়। যে কোনোও আফিসে সে এখন পঞ্চাশ-ষাট টাকা মাইনের চাকরি করতে পারে।

হাতে কাজের ভিড় থাকলে দু'-এক সময় বলরামকে কোনোও কিছু টাইপ করতে দিয়ে দেখা গেছে, না দিলেই ভাল হ'ত। তেরটি লাইনে বলরাম একাত্তরটি বানান ভুল ক'রে বসে আছে। অথচ বলাইয়ের ধারণা, ভগবান তার উপর নিছক ইনজাসটিস্ করছেন। তার এত বড় প্রতিভা মাঠে মারা যাচ্ছে।

কোন্ একটা কাগজে টাইপিস্টের জন্য বিজ্ঞাপন দেখে বলরাম দরখাস্ত লিখে এনেছে,—দরখাস্তকারী শ্রীবলরাম দাশ, পিতা মৃত নরহরি দাস, জাতি মাহিষ্য, সাং হবিবপুর, জেলা নদীয়া ইত্যাদি।

বলরাম দরখাস্তখানি পাঠাতে চায়। বললাম—"বেশ তো পাঠাও।"

বলরাম দাঁত দিয়ে তার জিভ কেটে বলল—"সর্বনাশ, সাহেব-বাড়ি কি বাংলায় দরখাস্ত পাঠানো যায়? ও তাঁরা পড়বেই না। আপনি দয়া ক'রে এর ইংরেজী ক'রে দিন, আমি বোঁ ক'রে টাইপ ক'রে দিচ্ছি এখনই।"

হাতে কাজ ছিল যথেষ্ট। বললাম—"শুধু দরখাস্ত দিলেই কি আর চাকরি হয় বলাই?—প্রশংসাপত্র চাই। হেড ক্লার্ক নীরোদবাবুর কাছ থেকে যদি একটা প্রশংসাপত্র আদায় ক'রে ফেলতে পার, তাহ'লে এ চাকরি তোমার নির্ঘাৎ হয়ে যাবে।"

কথাটি বলাইয়ের মনে লাগল। বলাই নীরোদবাবুর কাছে গিয়ে ধর্ণা দিল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু নীরোদবাবুরও কাজে অবসর নেই। বললেন—"বৃন্দাবনবাবুর কাছ থেকে লিখে নিয়ে এস, আমি সই করে দিচ্ছি।"

বলাই আবার আমার কাছে এসে ঘ্যানর-ঘ্যানর করতে শুরু করল। কি দুর্ভোগ! বললাম—"দাও কাগজ, লিখে দিচ্ছি।"

রাগের মাথায় যা লিখলাম তার অর্থ এই—"খুব আনন্দের সঙ্গে সার্টিফিকেট দিতেছি যে, বলরাম দাশ গত দুই বৎসর ধরিয়া আমাদের আফিসের টাইপরাইটার যন্ত্রটির পরমায়ু কমাইয়া দিতেছে। যদি কেহ দয়া করিয়া বলাইকে এখান হইতে সরাইবার কোনো রকম ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।"

নীরোদবাবু একটু হেসে বলরামের সার্টিফিকেটে সই ক'রে দিলেন। বলাই একটু চিন্তাকুল হয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করল—"আচ্ছা, নীরোদবাবু হাসলেন কেন?"

আমি বললাম—"তোমার অনেক গুণপনার কথা লিখেছি কিনা তাই বোধহয় নীরোদবাবু একটু হাসলেন।"

কলেজের ছেলেদের সঙ্গে বলাই রোজ ট্রেনে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করে। বলাই কলেজের ছেলেদের সেই সার্টিফিকেট দেখাল।

তারা বলল—"চমৎকার সার্টিফিকেট হয়েছে; এমন সার্টিফিকেটে তারা তোমায় না ডেকেই পারে না।" ছেলেরা বুঝিয়ে দিল—দরখাস্তে কি আর চাকরি হয়?—সার্টিফিকেটের উপরই তো চাকরি।

বলাই কলেজের সেই ছেলেদের কাছে আরও একটা সার্টিফিকেটের জন্য দাবি জানাল। তারা যা লিখল তার মর্মার্থ এই—"বলাই দাশের চাকরি হইতেছে অর্থাৎ সে এখান হইতে স্থানান্তরিত হইতেছে জানিয়া আমরা কতিপয় কলেজের ছেলে অতীব

আনন্দের সঙ্গে এই সার্টিফিকেট দিতেছি যে, কয়েক বৎসর হইতে বলরাম আমাদের সহযাত্রী। এই কয় বৎসর ধরিয়া ইংরেজী শিখাইয়া দিবার জন্য সে আমাদের জ্বালাতন করিয়া মারিতেছে। তাহার ধারণা, কেহ ইচ্ছা করিলেই তাহাকে দুই চারিদিনে ইংরেজী শিখাইয়া দিতে পারে। বলাই স্থানান্তরিত হইলে আমরা মুশকিল-আসান ফকিরের দারগায় পাঁচ পয়সায় সিন্নি কিনিয়া দিব মানত করিয়াছি।"

বলাই দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছে।

কি উত্তর এসেছিল জানি না। জিজ্ঞাসা করলে বলে—"চাকরি তো হয়েছিলই, কিন্তু অতদূর শাশুড়ী যেতে দিলেন না, তাই!"

ডাঁটা

যাঁরা বলেন, কলার কাঁদি দেখে বা সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুভ, তাঁদের কথায় আমি প্রতিবাদ করি। ঘটনাটা ঘটেছিল আমার নিজের জীবনেই এবং সে কথা আজও আমি ভুলতে পারিনি।

আষাঢ়ের রাত্রি। সকাল থেকে ঝুপ-ঝাপ বৃষ্টি নেমেই আছে। এমন রাত্রিতে মহাজনেরা খিঁচুড়ীর ব্যবস্থাই করে থাকেন, কিন্তু আমার ভাগ্যে ডাঁটা-চচ্চড়ী! মেস-বোর্ডিং জীবনের দুঃখই ওই। বাজারে যায়নি কেউ—যখন গেল তখন এক ডাঁটা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। অতএব আমাদের আজ রাত্রের মতো ব্যবস্থা--ডাঁটা ভাতে, ডাঁটা-চচ্চড়ী, ডালের মধ্যে ডাঁটা এবং ডাঁটার অম্বল!

আহারান্তে ব'সে ভাবছি—মুখ বদলান যায় কোথায়! এই দুর্দিনে যে কেউ নেমন্তন্ন করবে তারও আশা নেই। ঠিক এমনি সময়ে চিঠি এল সঞ্জীবদার কাছ থেকে। সঞ্জীবদা বড়লোকের ছেলে, বিদ্বান্ কিন্তু সন্ন্যাসী।

. বলা বাহুল্য, সন্ন্যাস-জীবনের উপর আমার যতটা শ্রদ্ধা থাক বা না থাক—পূজা-পার্বণ, দেবতা, মঠ, মন্দির প্রভৃতির উপর আমার চিরকাল অগাধ ভক্তি আছে। পূজা-পার্বণে নাড়ুটা কলাটা এবং মন্দিরে ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়া আমার অভ্যাস ছিল।

সঞ্জীবদা বললেন—"নতুন গাছে মর্তমান কলা হয়েছে। দিয়ে আসতে পারবে সারগাছির আশ্রমে কলার কাঁদিটা?"

কথায় বলে ভাত খাবি? না, ডাকে কে? সঞ্জীবদার কাছেই শুনেছিলাম, ওদের ওই আশ্রমের মঠে খাওয়া-দাওয়ার খুব জুত আছে। অবশ্য নিরামিষ। তাহ'লেও দুধ, দই, ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ এসব সেখানে অঢেল!

ভাবলাম—যাক্, এবার মুখটা বদলে আসা যাবে !

একটা বড় বস্তার মধ্যে কলার কাঁদিটা পুরে নিয়ে কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠলাম।

ট্রেন মুড়াগাছা স্টেশনে এলে নিজের অজ্ঞাতেই মনটা কেমন প্রলুব্ধ হয়ে উঠল। মুড়াগাছা ছানার জিলিপির জন্য বিখ্যাত। খাবারওয়ালা কামরার কাছে এসে হাঁক দিচ্ছে—"চাই ছানার জিলিপি, টাটকা ছানার জিলিপি চাই।"

তাড়াতাড়ি মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলাম—ব্রাহ্মণের ছেলে, মঠে ঠাকুর-দর্শনে যাচ্ছি, সকালে হাতমুখ ধোওয়া পর্যন্ত হয়নি,—এখনই খাই-খাই !

—"বাবু, খাবার চাই ?"

মনটাকে ফিরাবার জন্য ভাবতে লাগলাম—যেন কারও সাংঘাতিক অসুখ, আমি দেখতে যাচ্ছি—

—"বাবু, গরম চা—"

কল্পনা করলাম—রেলওয়ে অ্যাকসিডেন্ট। লাইনের ওপর একটা মানুষের পা কেটে দু'খানা হয়ে গেছে !

মুড়াগাছা স্টেশন থেকে গাড়ি ছেড়ে দিল। আত্মজয়ের গৌরবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

নির্দিষ্ট স্টেশনে নেমে কুলীর খোঁজ করব, এমন সময় আমার চা-জিলিপি প্রবঞ্চিত ক্ষুব্ধ মন ব'লে উঠল,—এর বেলা ? গান্ধী, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর এঁরা কুলী ডেকেছেন কোনো দিন ? এই তো ক'মিনিটের রাস্তা—মাঠটা পেরুলেই মঠ—এর জন্য সামান্য একটা কলার কাঁদি বইবার ক্ষমতা হ'ল না ? যত বুজ্‌রুকি বুঝি জিলিপির বেলায় ?

মেঠো রাস্তা। বর্ষাকাল। ভয়ানক কাদা। অগত্যা জুতো খুলে এবং কলার কাঁদি মাথায় নিয়ে নেমে পড়লাম পথে।

বাপরে ! রাস্তায় কি কাদা ! গায়ে আমার লাল খদ্দরের পাঞ্জাবী, বগলে ছাতা, পৃষ্ঠে ও বক্ষে ঝুলায়মান জুতা আর মস্তকে সেই

কলার কাঁদি। এক হাঁটু কাদাভেঙ্গে এগিয়ে চললাম মঠের দিকে।

অর্ধেক রাস্তায় গিয়েছি এমন সময় এক মোষ—বোধহয় আমাকে কোনোও বিশিষ্ট জীব মনে ক'রে দূর থেকেই 'যুদ্ধং দেহি' ভাব ঘোষণা করল।

শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা নয়। আজ এক হাঁটু কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করলাম, স্বয়ং দণ্ডধারী যম তাঁর ঐ রুদ্র মূর্তি বাহনের উপর বিরাজ করছেন। ভয়ে গলা শুকিয়ে এলো—চিৎকার ক'রে বললাম,—"ওরে, কার মোষ রে?"

"লাল জামা খুলে ফেলুন বাবু"—পেছন থেকে মোষের মালিক আমাকে অভয়বাণী শোনাল, "ও পাগলা মোষ, লাল কিছু দেখলেই ক্ষেপে যায়।"

চরিতার্থ হ'লাম। কিন্তু মহাপঙ্কে নিমগ্ন হয়ে কি ক'রে জামা খুলি?

মোষ তখন নিকটে এসে পড়েছে—তার সেই ফোঁস্-ফোঁস্ শব্দে অতি বড় সাহসীরও প্রাণ আঁতকে ওঠে।

বিপাকে না পড়লে মানুষের বুদ্ধি খোলে না। কলার কাঁদি কাদার মধ্যে ফেলে তাড়াতাড়ি কোঁচার কাপড় দিয়ে গায়ের লাল জামা ঢেকে নিলাম। লোকজন ছুটে এলো। অপমৃত্যুর হাত থেকে কোনো রকমে বেঁচে গেলাম।

সারাটা দিন পেটে কিছু পড়ল না—বেলা আড়াইটার সময় মঠে খাবার ডাক পড়ল। লাল ভাত, লাল রংয়ের জলীয় ডাল এবং ডাঁটার চচ্চড়ী ও অম্বল! অথচ বড় বড় ভাগলপুরী গাই বাঁধা রয়েছে দেখলাম অনেকগুলো! যাত্রার দোষ বলতে হবে বৈ কি! সেদিন পূর্ণিমা ব'লে রাত্রেই নাকি সেখানে প্রসাদের ভালো ব্যবস্থা আছে!

না, আশা করে আর কাজ নেই—বড় আশা ক'রেই তো এখানে আসা গিয়েছিল। কিন্তু আশা ফলল কই? সুতরাং বিকেলের গাড়িতে প্রস্থান করব মনস্থ করলাম।

ডাঁটা কিন্তু তবুও আমায় ছাড়ল না। স্বামীজি বললেন,—"সজীব যেমন নিজের গাছের কলা পাঠিয়েছে, আমরাও তেমনি নিজেদের ক্ষেতের ডাঁটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ তোমাকে নিয়ে যেতেই হবে।"

মঠে শিষ্য-সেবকের অভাব নেই। অশ্বত্থ গাছের মতো বিরাট দুই ডাঁটা গাছ তারা তুলে দিয়ে গেল ট্রেনে।

সারা রাস্তা যাত্রীদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আমার প্রাণান্ত—ডাঁটা কোথাকার, এত বড় ডাঁটার বীজ কোথায় পাওয়া যায়, খেতে মিষ্টি কেমন ? এই সব প্রশ্ন।

সন্ধ্যায় স্টেশন থেকে সোজা সজীবদার বাড়ি। দাদা বললেন,—"রাত্রে এখান থেকেই খেয়ে যেও।"

ভাবলাম, এইবার হয়ত মুখটা বদলান যাবে। কিন্তু আমি কম্‌লিকে ছাড়লেও কম্‌লি আমাকে ছাড়বে না! খেতে ব'সে দেখি, ডাঁটার তরকারি, ডাঁটার চচ্চড়ী এবং ডাঁটার অম্বল! চোখে আমার জল এসে গেল। রাগের মাথায় ব'লে ফেললাম—"এই ডাঁটা আমার দু'চোখের বিষ!"

সজীবদার মা বললেন—"তা কি হয় বাবা, নিজে ঘাড়ে করে টেনে এনেছ—তোমার জন্যই তো—"

সজীবদা অবাক হয়ে বললেন—"বল কি হে? ডাঁটা পছন্দ কর না! ডাঁটার মধ্যে যথেষ্ট ভিটামিন আছে যে—একেবারে এ. বি. সি ডি।"

হোম লাইন ও ফরেন লাইন

রূপসা থেকে বাগেরহাট লাইন। ওদিক্‌কার লোকেরা ওটাকে 'হোম লাইন' বলে শুনলাম। বাস্তবিক গাড়িতে 'অ্যাট হোম' অনুভব করতে এমন লাইন আর পাবেন না!

রাস্তায় যেতে যেতে আমরা যেমন পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের খোঁজ খবর নিই—"কেমন আছ? খেঁদুর বিয়ে কোথায় হ'ল? বিপিনের ছেলের চাকরি হয়েছে কি না? ওরাও তেমনি এই হোম লাইনের ট্রেন গাড়িতে যেতে যেতে রাস্তার লোকের সঙ্গে আলাপ করে: ও জগন্নাথ, ফুলতলার হাটে গিইলে?

লাইনের ছু'ধারে ঘন বসতি। পান, সুপারী, নারকেল, পাঠশালা, পোস্ট আফিস, বাজার, বারোয়ারী তলা, ধোপাবাড়ি এরা যেন যাত্রীদের অভিনন্দন জানাচ্ছে!

পল্লীর ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে এই ছোট লাইন। এর গতি মন্থর। দাওয়ায় ব'সে যারা হুঁকো টানছে, তারা সুযোগ পেলে তোমার হাতে হুঁকোটা তুলে দিতেও কুণ্ঠিত নয়।

কথায় বলে: 'মানুষের কুটুম এলে গেলে।' রূপসা লাইনে যারা যাওয়া-আসা করে তারা সকলেই প্রায় ওদিক্‌কার লোক। ছু'বেলা যাওয়া-আসার জন্য তাদের সঙ্গে লাইনের ছু'ধারের বাসিন্দাদের কুটুম্বিতা এই জন্যই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ট্রেন চলেছে। ছোট লাইনের ট্রেন। জানালার ধারে যে ভদ্রলোক ব'সেছেন, এ-লাইনে তাঁর এই প্রথম আগমন। তিনি অবাক হয়ে বললেন,—"কি সর্বনাশ! এ-দেশের গাড়িতে চেন থাকে না নাকি? আলো, শেকলও নেই!"

হোম লাইনের একজন উত্তর দিলেন—"কি আর দরকার মশায় ঝঞ্ঝাটে? ছু' ধারেই তো লোকজনের বাড়ি—হ'লই বা গাড়ির মধ্যে অন্ধকার!"

—"কিন্তু শেকলটা যে এসেনসিয়ালি দরকার। ধরুন, যদি একটা ভয়ানক বিপদ—"

—"এ লাইনে বিপদ-টিপদ কিছু নেই মশায়। স্টেশনে কোনো কিছু ভুলে ফেলে এলে পাশের বাড়িতে ডেকে ব'লে গেলেই তারা নিয়ে এসে যত্ন করে তুলে রাখবে।"

—"কিন্তু ধরুন, ইন কেস্ অব ইমারজেন্সি—"

হোম লাইনের আর একজন উত্তর করল—তাহ'লে ডেকে বললেই ট্রেন থামবে। সেবার আমার দিদিমাকে নিয়ে আসছি,—কিভাবে তাঁর তামাকপোড়ার কৌটোটি প'ড়ে গেল লাইনের পাশে। তড়াক ক'রে নেমে দৌড়ে গিয়ে ড্রাইভার ইসমাইল জোয়ারদারকে বললাম—চাচা, ভেরি ডেনজার! সংসারে সবকিছু ছাড়তে পারে দিদিমা, কিন্তু ঐ তামাকপোড়ার কৌটোটি তাঁর জীবন-মরণের সঙ্গী—ওটি তার চাই-ই চাই। গাড়ি থামল।"

—"কিন্তু আপনাদের লাইনের গাড়িতে 'চেন' থাকে না—এটা বড়ই দুঃখের কথা।"

হঠাৎ পানের বরজের মধ্যে শিয়াল ডেকে উঠল।

—"ওকি মশায়, শিয়াল ডাকছে নাকি?"—ফরেন লাইন জিজ্ঞাসা করেন।

হোম লাইন উত্তর দেয়—"ডাকছে না মশাই, শিয়াল ডাকছে না; ওরা কাঁদছে!"

—"কেন?"

—"আপনার দুঃখে বনে শিয়াল কাঁদছে!"

বেঞ্চির ও-দিক্‌টায় একজন অসুখের ভান ক'রে ঘুমিয়ে ছিলেন। ইনিও ফরেন লাইন। মন্তব্যটা তাঁর গায়ে লাগল। আস্তে আস্তে উঠে বসে তিনি বললেন—"বিপদ বলতে আপনারা কি তামাক-পোড়ার কৌটো পড়ে যাওয়া মনে করেন নাকি?"

—"করবই-বা না কেন মশাই, এ বিপদটা কি কম?—ধরুন,

আপনি পান-বিড়ি-সিগারেট-নস্যি-জরদা এমন সব কিছুর যে কোনোও একটা বা একাধিক নেশার জিনিস ব্যবহার করেন। ওটা হারিয়ে গেলে দোকানে কিনতে পাবেন, কিন্তু তামাকপোড়া ? কোনোও দোকানে আপনি ওটা কিনতে পাবেন না, অথচ এই দিদিমা জাতটা—"

হোম লাইনের আর একজন বলল—"আরে মশাই, ছোট লাইনের ছোট বিপদ, বড় লাইনের বড় বিপদ—এ তো সহজ কথা।

হোম লাইনের আর একজন তাঁর সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে বললেন—"তবে শুনুন মশাই, আপনাদের মেন লাইনের মেল গাড়ি তো শেকল টানলে থামে না !"

—"থামে না !"

—"না, থামে না। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলছি শুনুন।

: ঢাকা মেল। কার সাধ্যি গাড়িতে মাথা ঢোকায়। কালুখালি স্টেশনে যখন গেলাম, তখন রাত্রি তিনটে হবে। একটি ভালো মানুষ গোছের ভদ্রলোক কয়েকজন মেয়েছেলে ও কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে উঠবেন সেই গাড়িতে। সে কি ভালো মানুষের কর্ম রে মশাই, অনেক চেঁচামেচি, অনুরোধ-উপরোধ ক'রে ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন। আমি অতিকষ্টে দরজাটা খুলে দিয়ে মেয়ে-ছেলেদের আগে তুলে নিলাম। সকলেই তখন সেই দরজা দিয়ে উঠতে চায়। এক ভদ্রমহিলার কোলে ছিল তিন-চার 'বছরের একটি ছেলে, সে চেপটে মারা যায় আর কি ! অবশেষে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে এক ঝাপটায় তাকে তুলে নিলাম কোলে। ক্রমে তাদের দাঁড়াবার মতো জায়গা একটু হ'ল। গার্ড সাহেব দিল হুইসেল, গাড়িও নড়ে উঠল। এক মুহূর্তের ব্যাপার। ঠিক সেই সময়ে ওদের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল এক সন্তানহারা জননী : আমার ছোট ছেলে নরেন ? নরেন যে পড়ে থাকল ! হায় হায় ! ও বাবা নরেন—

ঐ যে, ঐ যে, আমার ছেলে নরেন!

ওদের উঠবার সময় দেখেছিলাম, দু-একটি ছোট ছেলে প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে। নরেন হয়ত ওদের মধ্যেই কেউ হবে।

জননীর করুণ আর্তনাদ গাড়ির শব্দকেও ছাড়িয়ে উঠল। চলন্ত গাড়ি থেকে তিনি লাফ দিতে চান!

ওদিকে ছিলেন একজন শক্তিমান্ যুবক। তাড়াতাড়ি তিনি শেকল টেনে ধরলেন—ধরে একেবারে ঝুলে পড়লেন, তবুও গাড়ি থামল না, একে একে চার-পাঁচটি যুবক তাঁদের রিস্টের শক্তির পরিচয় দিলেন শেকলের কাছে; কিন্তু গাড়ি থামা তো দূরের কথা, আরও বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ গাড়ির আলোও গেল নিভে।

অন্ধকার ভেদ ক'রে গাড়ি ছুটছে—ভিতরে 'হায় হায়' শব্দ, কল-কোলাহল আর জননীর মর্মভেদী আর্তনাদ!

একটি লোকের সঙ্গে হারিকেন লণ্ঠন ছিল। তিনি ওটা জ্বেলে উঁচু ক'রে ধরতেই জননী চেঁচিয়ে উঠলেন: ঐ যে! ঐ যে আমার ছেলে নরেন! মানিক আমার—

তাই তো! সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি, আমার কোলের সেই ছেলেটিই তাঁর নরেন! উঠবার সময়কার ধস্তাধস্তি আর গাড়ির ভিতরকার হৈ-চৈতে ছেলেটি হতভম্ব হয়ে পড়েছে।"

—"আপনি তো আর হতভম্ব হননি মশাই! মা যখন ছেলের জন্য কেঁদে উঠল, তখন বললেই পারতেন—এই যে সে আমার কাছে!" ফরেন লাইন বললেন।

হোম লাইন জবাব দিলেন—"এই বুদ্ধি নিয়ে আপনারা মেল-এক্সপ্রেসে চড়েন? সে-ই যে নরেন, তা আমি কি ক'রে জানব বলুন!"

ওদের সাথে যায় না পারা

বিশ্বনাথবাবু অফিস থেকে ফিরতেই প্রতিমাদেবী নালিশ করলেন : হয় গুণধর পুত্র দু'টিকে সঙ্গে করে অফিসে যাও, আর না হয় এই ছুটির ক'দিন আমাকে কোথাও পাঠাও।

: কেন, হ'ল কি ?—জিজ্ঞাসা করেন বিশ্বনাথবাবু।

: হ'ল না কি তাই বল ! সারাটা দুপুর চোখের পাতা এক করতে দেবে না। বইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই—কোথায় ঘুড়ি-লাটাই, দোতলার ছাদে গিয়ে দু'জনে এই দুপুর রোদ্দুরে ঘুড়ি ওড়াবে ! আর সে কি দুম্‌দাম্ শব্দ ! পাড়ার লোকের পর্যন্ত অশান্তি—ধর ধর, পড়ে যাবে, গেল গেল—এইসব চিৎকার।

কীর্তি ও কল্যাণ দুই ভাই। ইস্কুলে পড়ে। গরমের ছুটি। ওরা বলে : আম খাওয়া আর ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য ইস্কুল বন্ধ।

সব শুনে বিশ্বনাথবাবু হাঁক দিলেন : কীর্তি—কল্যাণ—

কাঠগড়ার আসামীর মতো দু'ভাই সভয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

: অঙ্ক করেছ ?

: হ'ল না বাবা।

: কেন ?

: ও অঙ্ক ভুল। হয় না—

: অঙ্ক ভুল !—কি অঙ্ক বল দেখি—

কীর্তি বই খুলে পড়ে : পাঁচ বছর আগে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের সাতগুণ ছিল। দশ বছর পরে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের তিনগুণ হবে। আরও কুড়ি বছর পরে পিতার বয়স পুত্রের দ্বিগুণ হবে। এখন পিতা-পুত্রের বয়স কত ?—এটা কেমন ক'রে হবে ? জিজ্ঞাসা করে কীর্তি। প্রথমে পিতার বয়স ছিল সাতগুণ, তারপর কমে গিয়ে হ'ল তিনগুণ, তারপর হবে দ্বিগুণ ! এমনি ক'রে কি

পিতা আর পুত্রের বয়স শেষটায় সমান হয়ে যাবে নাকি ?—এ হয় না, হ'তে পারে না। এ অঙ্ক ভুল !

বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন : হুঁ।

: আর কল্যাণ ? ট্রানস্লেশন করতে বলেছিলাম—

: করেছি বাবা।

: কই দেখাও। 'কাশীর নিকট সারনাথ'—কি লিখেছ বল ?

: ম্যানিউর হ্যাসব্যাণ্ড ইজ—

: ম্যানিউর হ্যাসব্যাণ্ড ইজ !—সে আবার কি ?—বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন বিশ্বনাথবাবু।

: কীর্তি বলে দিয়েছে বাবা।

: হ্যাঁ বাবা, ডিকস্‌নারিতে লেখা আছে। উত্তর দেয় কীর্তি।

: তুমি তো সব কথা ডিকস্‌নারি দেখে লিখতে বলেছ। ডিকস্‌নারিতে লেখা আছে 'সারের' ইংরেজী ম্যানিউর, আর 'নাথ' হচ্ছে হ্যাসব্যাণ্ড।

: তোমার মাথা ! উত্তেজিত হয়ে বললেন বিশ্বনাথবাবু। সারাটা দুপুর ছাদে গিয়ে ঘুড়ি উড়াবে—পড়াশুনার বেলায় অষ্টরম্ভা—বেত নিয়ে এস।

: আর করব না বাবা—উভয়ে একসঙ্গে মিনতি করে বলে।

: কি করবে না ?

: ঘুড়ি উড়াব না।

: আর দুমদাম করে ছাদে উঠা আর নামা ?

: তাও করব না।

: ঠিক ?

: ঠিক !

: নাকে খৎ দাও দু'জনে। বল, কখনও উপরে উঠবে না।

উভয়ে নাক মাটিতে ঘষে বলে : কখনও উপরে উঠব না।

: কিছুই পড়াশুনা কর না তোমরা। বলেন ওদের মামা। জজ

কোর্টের উকিলের মুহুরী তিনি। তোমাদের এই বয়সে আশু মুখুজ্যে ছিলেন ক্লাসের মধ্যে ফার্স্ট বয়।

: তোমার বয়সে তিনি কি ছিলেন মামা ?—জিজ্ঞাসা করে কীর্তি।

কল্যাণ তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়: হাই কোর্টের জজ। কথায় এদের সঙ্গে পারা শক্ত।

ইস্কুল থেকে ফিরে এসেছে কীর্তি-কল্যাণ দুই ভাই, ক্লাস বসে গিয়েছে ব'লে।

তাদের মা প্রতিমাদেবী রাগ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন: ক্লাস বসবার আগে যেতে পারনি কেন ?

কল্যাণ কাঁদ-কাঁদ হয়ে উত্তর দেয়: আমরা যাওয়ার আগেই ক্লাস বসে গিয়েছিল যে! উত্তর শুনে প্রতিমাদেবী নিরুত্তর।

রং খেলতে গিয়ে কল্যাণের সারা মুখে লেগেছে কালী। ওদের দাদু রাগ ক'রে বলেন: আহা, কি রূপের ছিরি!—যেন রূপী বাঁদর!

কীর্তি বলে: দাদু, সবাই বলে, কল্যাণের মুখ ঠিক ওর দাদুর মতো!

উত্তর শুনে দাদু গুম হয়ে থাকেন।

নতুন মাস্টারমশাই ওদের কাকাকে বললেন: ওদের রেজাল্ট ভালো হয় না তার একমাত্র কারণ মনোযোগের অভাব। ওরা অঙ্ক করে, কিন্তু ভাসা-ভাসা। গভীরভাবে কিছু ভাবেও না, দেখেও না।

তাঁর কথা কতদূর সত্যি তা দেখাবার জন্য তিনি ওদের বললেন: আমি কতকগুলি সংখ্যা লিখছি দেখ। এই ব'লে তিনি মুখে বললেন একষট্টি। কিন্তু বোর্ডে লিখলেন ১৬। মুখে বললেন তেইশ, কিন্তু বোর্ডে লিখলেন ৩২। বললেন সাতচল্লিশ—কিন্তু লিখলেন ৭৪।

ওরা চুপ করে আছে, কথা বলে না।

মাস্টারমশাই ভাবেন—তারা অন্যমনস্ক।

: আচ্ছা, এবার এগুলির যোগফল থেকে কত বিয়োগ করব তোমরাই বল—

কল্যাণ চুপি চুপি বলে : দাদা, বল পঞ্চান্ন কি ছেষট্টি—দেখি উনি উল্‌টিয়ে কি লেখেন। অপ্রতিভ হয়ে পড়েন মাস্টারমশাই।

দিন কয়েক পরের কথা।

লাইব্রেরির মাঠে ফুটবল খেলছে কীর্তি আর কল্যাণ। অদূরে একপাশে মান্ধাতার আমলের এক বড় ইঁদারা। কেউই এখন ব্যবহার করে না সে ইঁদারা। তার মধ্যে এবং উপরে ঘাস জঙ্গল হয়ে ইঁদারার অস্তিত্বটাই লোপ হয়ে গেছে সাধারণের চোখে। তাতে জল আছে কি নেই সে প্রশ্ন এখন কারও মনে জাগেই না। কীর্তি-কল্যাণের বল গিয়ে পড়ল এঁদো ইঁদারার ঝোপের মধ্যে। কে তুলবে সেই বলটিকে ঐ অন্ধকূপের ভেতর থেকে?

ইঁদারার ভেতরটা অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। কল্যাণ বলে : দাদা, কুরু-পাণ্ডবের বলও তাঁদের ছেলেবেলায় এমনি কুয়োর মধ্যে পড়েছিল জানিস?

: কিন্তু অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য তীর মেরে সেই বলটা তোলেন। উত্তর দেয় কীর্তি—আমরা এখন সে আচার্য পাব কোথায়?

: কেন, তোদের অঙ্কের মাস্টার রণজিৎ আচার্য?

কীর্তি উপেক্ষা ভরে উত্তর দেয় : ধ্যেৎ।

: তুই আমার মাজায় একটি দড়ি বেঁধে দে দাদা, আমি নেমে যাই।

কিন্তু দড়ি কোথায় পাওয়া যাবে? অগত্যা দুই ভাই-ই নেমে গেল সেই ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে। অনেক চেষ্টার পর বল পাওয়া গেল। কিন্তু তারা যখন উপরে উঠল, তাদের সর্বাঙ্গ মশার কামড়ে একেবারে চাক-চাক হয়ে গেছে—মুখ কপাল ফুলে উঠেছে লাল হয়ে। বাড়ি ফিরল দুই ভাই।

কিন্তু তারা ফিরবার আগেই বল কুড়ানোর খবর পৌঁছে গিয়েছিল

ওদের বাড়িতে। বিশ্বনাথবাবু বেত হাতে নিয়ে তৈরি হয়েই ছিলেন।

: এদিকে এস : সারা গায়ে মশায় কামড়ের দাগ কেন ?

: বল আনতে ইদারার মধ্যে নেমেছিলাম তাই—

: সেদিন তোমরা নাকে খৎ দাওনি ?—বেতগাছটা মাটিতে সপাং করে শব্দ করে বিশ্বনাথবাবু হুংকার দিয়ে উঠলেন : বল, নাকখৎ দিয়েছিলে কিনা ?

ওরা কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দেয় : দিয়েছিলাম।

: তবে ঐ পচা ইঁদারার মধ্যে নামলে কেন ?

কীর্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দেয় : তুমি তো উপরে উঠতে নিষেধ করেছিলে—

: তবে ?

ভয়ে কীর্তি আর জবাব দেয় না। তার কথার পরিপূরণ করে কল্যাণ। কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দেয় সে : আমরা তো নীচেয় নেমেছিলাম বাবা। বিশ্বনাথবাবু বিস্মিত হয়ে থাকেন তার উত্তর শুনে !

হাসপাতালেও হাসি আছে

পর পর তিনটি গোল খাওয়ার পর স্থির ক'রে ফেললাম,—খেলা ছেড়ে পালাতে হবে ; কিন্তু পালাতে হবে বললেই তো আর পালানো যায় না,—লোকে লো লো ক'রে পেছনে ছুটবে যে !

সুতরাং বিপক্ষেরা একটা 'ফাউল' করা মাত্র সে সুযোগ আর ছাড়লাম না,—চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম সেখানে। দাঁত কপাটি লাগার কপট ভঙ্গী ক'রে প'ড়ে রইলাম মাঠে।

অমনি আমাকে হাতে হাতে ধরে বাইরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। এলো বরফ, পাখা এবং জল। আমার অবস্থা দেখে স্বপক্ষীয়েরা চেচাঁতে লাগল,—মেরে দাও, আমরাও ফাউল করতে জানি।

অবস্থা বুঝে আমাকে চোখ বুজেই পড়ে থাকতে হ'ল। হাসপাতালে গিয়ে আমার কৃত্রিম জ্ঞান হওয়ার পর ডাক্তাররা সব দেখে-শুনে এবং গবেষণা ক'রে বললেন—কথা বলা একদম নিষেধ। যদি কিছু চাইতে হয়, তা মুখে না ব'লে লিখে জানাতে হবে। এজন্য আমাকে কাগজ-কলমও দেওয়া হ'ল।

বলা বাহুল্য, আমার হাতের লেখাটা ডাক্তারদের প্রেসক্রিপসনের মতোই দুর্বোধ্য ! একবার আমি কার একটা বিয়ের ব্যাপারে আমার এক বন্ধুর কাছে চিঠি দিয়ে কিছু ফুল চেয়েছিলাম। ঠিক বিয়ের দিন সে আমাকে এক ঝুড়ি কুল পাঠিয়ে দিয়েছিল !

আর একবার আমার ভাইকে বাবার গুরুতর অসুখের সংবাদে লিখেছিলাম,—'তিনি সকালে সংজ্ঞা লাভ করেছেন।' কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, ভাই সেই লেখার পাঠোদ্ধার করেছিল—'তিনি সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ করেছেন !'—তারপর ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছিল, তা কল্পনা ক'রে নিতে কারও কষ্ট হবে না আশাকরি !

হাতের লেখা খারাপ ব'লে কানমলা খেয়েছি ছেলেবেলায়। কিন্তু

সেই খারাপ লেখার ফলশ্রুতি যে এতদূর গড়াবে তা বুঝতে পারিনি তখন।

যা হ'ক, হাসপাতালের নির্দেশ আমাকে মেনে চলতেই হবে।

সকালে নার্সের হাতে লিখে দিলাম, ভাল বিস্কুট চাই। নার্স খানিক পরে ডাক্তারের উত্তর নিয়ে এল,—ডালমুট ইজ নট অ্যালাউড ইন হসপিটাল!

রেগে গিয়ে আমি সোজা কথায় লিখে জানালাম—খেতে দাও। এবারও ডাক্তার মন্তব্য করলেন,—নট অ্যালাউড!

আশ্চর্য ব্যাপার! এদিকে ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। উপায় না দেখে রেগে-মেগে আমি চেঁচাতে আরম্ভ করলাম। ডাক্তার ছুটে এসে বললেন,—তুমি লিখেছ যেতে দাও। কিন্তু যখন তখন তো রোগীকে যেতে দেওয়ার নিয়ম নেই হাসপাতালে।

আমার রক্তটা পরীক্ষা করে ডাক্তার খুব গম্ভীর হয়ে বললেন—চাপের জন্য তো বিশেষ ভাবনা ছিল না, কিন্তু রক্তে যে দেখছি—শতকরা তিরিশ ভাগ এ্যালবুমিন, পঁচিশ ভাগ ক্যালসিয়াম, তিরিশ ভাগ কোলেস্টিরোল এবং কুড়ি ভাগ সুগার—

আশ্চর্য তো! শুনে আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসে! সবগুলো যোগ দিলে তো একশোই হয়—আমার রক্তে তাহ'লে রক্ত নেই!

কিন্তু আমার সব চাইতে বেশি ভয় হ'ত তখন,—যখন কয়েকজন ডাক্তার মিলে আমার ঘরের এক কোণে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলতেন।

আমার বেড-এ চুপচাপ শুয়ে আছি একদিন। এমন সময়ে কয়েকজন ডাক্তার সেই ঘরে এসে ফিস্‌ফিস্ ক'রে যেন কি সব বলাবলি করতে লাগলেন। আমার দিকে তাঁরা কেউ কেউ একবার তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন।

আমার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এঁরা আমাকে

অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাবেন না তো! মুখের চাদরটা সরিয়ে ওদের দিকে তাকাতেই ডাক্তারগুলি পাশের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে আবার কি সব আলোচনা করতে লেগে গেলেন।

ভয় আমার বেড়ে গেল আরও!

বেড থেকে নেমে পা টিপে-টিপে দরজার পাশে গেলাম। কী সাংঘাতিক আলোচনাই না জানি তাঁরা কচ্ছেন। ভাবলাম, যদি ওঁরা আমার কোথায়ও অপারেশন করবার মতলব এঁটে থাকেন, আমি এখনই মারব ছুট্! যা থাকে কপালে, এক দৌড়ে হাসপাতাল থেকে পালাব।

তাঁদের আলোচনা শুনবার জন্য কান পেতে রইলাম। বুকের মধ্যে চিপচিপ করছে তখন।

না, ভয়াবহ কোনোও ব্যাপার নয়,—আগামী রবিবার তাঁরা কোথায় পিকনিক করতে যাবেন, তারই আলোচনা!

হাবুলের অভ্যাস যোগ

ট্রামের মধ্যে একটা গুরুতর পরিস্থিতি হ'লে লোকে যেভাবে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায়, হাবুলও ঠিক সেইভাবে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল আমার কাছে। প্রত্যেকটি যাত্রীর কৌতূহল-দৃষ্টি তার উপর—ব্যাপার কি ?

হাবুল আমার জুতোর ধুলো মাথায় দিয়ে একগাল হেসে বলল : ছোট কাকা, ভালো আছেন ? এই তুচ্ছ কথাটির জন্য এত ভিড়, ঠেলাঠেলি ! যাত্রীরা কেউ হাসল, কেউ তাচ্ছিল্যভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল।

হাবুলের সঙ্গে অনেককাল পরে দেখা—হাঁ, তা প্রায় পাঁচ-ছ বছর হবে। শুনেছিলাম হাবুল নিখোঁজ হয়ে গেছে ; তাই মনের মধ্যেও জাগেনি তার কথা এই কয় বছরের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করলাম : কেমন আছিস হাবুল ?

হাবুল আবার একটু হেসে উত্তর দিল : আজ্ঞে ভালোই আছি।

এটা তার বাঁধাধরা উত্তর। ওর কাকা আমার সঙ্গে পড়ত। হাবুল তখন ছোট। তখন থেকেই আমি হাবুলের চরিত্র সম্বন্ধে জানি, অত্যন্ত দুঃসময়েও জিজ্ঞাসা করলে সে বলত : "ভালোই আছি।"

সুতরাং হাবুলের 'ভালোই আছি' উত্তরে প্রমাণ হয় না সে সত্যিই ভালো আছে। সে নিখোঁজই বা হ'ল কেন, এখন করেই বা কি, জানবার জন্য মনের মধ্যে একটা আগ্রহ দেখা দিল।

পাশের ভদ্রলোক উঠে যেতেই হাবুলকে বললাম : বোস্।

এই বেকার সমস্যার যুগে কে কি করে—জানবার জন্য আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক নয় ; তবু হাবুল কি করে জানবার জন্য আগ্রহ হয়েছিল আমার—তোমাদেরও হ'ত যদি জানতে এ পর্যন্ত কতগুলি চাকরি সে ছেড়েছে এবং কোন্ ধরনের চাকরি সে করে।

হাবুল পরিশ্রমের কোনো কাজ করতে পারবে না, শুয়ে-বসে-ঘুমিয়ে—তাস খেলে বা গান করে যদি কোনো চাকরি করা যায় তা' হলেই হাবুল তাতে রাজী আছে। এক কথায়—হাবুল হচ্ছে পয়লা নম্বরের অলস।

খোঁজ ক'রে সে বের করতেও পারে এই ধরনের চাকরি।

একবার কোন্ কলুর ঘানির তক্তায় শুয়ে গান করবার চাকরি সে পেয়েছিল। আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাবুল চাকরি নিল—তক্তায় শুয়ে শুয়ে গান করলেই বলদ ঘুরবে! কলুর চোখ ঢাকা বলদ তো!

কিছুদিন পরেই হাবুলের সে চাকরি গেল। বলল: এমন পাজি গরু, গান করতে করতে একটু ঘুমের তন্দ্রা এসেছে কি অমনি ঠায় দাঁড়িয়ে গেল।

এই ধরনের চাকরি হাবুলের অনেক এসেছে এবং অনেক গিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম হাবুলকে: কিছুদিন তুই গা-ঢাকা দিয়েছিলি শুনেছিলাম—কি ব্যাপারটা বল তো?

হাবুল লজ্জিত হয়ে বলে: সে অনেক কথা।

আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করি: খুলেই বল দেখি শুনি।

ভবানীপুর নামব কথা ছিল কিন্তু হ'ল না। হাবুলের সঙ্গেই চললাম বালীগঞ্জ পর্যন্ত।

: একটা চাকরি পেয়েছিলাম—যাত্রার দলে—হাবুল খুব ধীরে ধীরে বলে।

: যাত্রার দলে!—বিস্মিত হই আমি: সে তো ভয়ানক খাটনি।

: আজ্ঞে না। দড়ির উপর পোশাক ঝুলানো থাকবে—যখন যার যেটা দরকার দিয়ে দিলেই বাস্—আর কোনো কাজ নেই।

: বেশ, বেশ, তা চাকরির ঐ পোস্টটার নাম কি?

: ড্রেসিং অফিসার।

: বাঃ—অফিসারের পোস্ট। তা খাসা চাকরি। তারপর?

: ওর মুশকিল ছিল একটা—কোন্ পোশাক কাকে দিতে হবে তা জানা। প্রথম প্রথম আমার গোলমাল হয়ে যেত। তাড়াতাড়িতে ব্রহ্মার চুল-দাড়ি দিতে হয়ত পাকা চুল আর কালো ফ্রেনচ্‌কাট দাড়ি দিয়ে দিলাম। বেচারা পাঠ মুখস্থ করতে করতে তাই পরে—যেই ঢুকেছে আসরে আর অমনি চারদিক থেকে হো-হো—তখন পালিয়ে বাঁচে ব্রহ্মা আর যত রাগ ঝাড়ে আমার ওপর।

: তারপর ?

: তখন ঠিক করলাম, কার কোন্ ড্রেস একটা তালিকা করে নেওয়া যাক্। যাতে মনে থাকে সেই জন্য কবিতা করে লিখলাম—

ব্রহ্মার পাকা দাড়ি সাদা চুল,
নারদের গেরুয়াতে নাহি ভুল।
কৃষ্ণের হাতে বাঁশি পায়ে নূপুর,
রাধার মতিমালা, মাথায় চূড়।

: বাঃ—এ বেশ কবিতা! সেই 'ফিলসফার—বিজ্ঞ মানুষ, কিউকাম্বার শশা'র মতোই।

হাবুলকে উৎসাহ দিয়ে বলি : তারপর ?

: একবার অনেক রাত্রে ঘুমের ঘোরে মুখস্থটা গোলমাল হয়ে যাওয়ায় কৃষ্ণের মাথার কার্লিং চুল গিয়েছিল ব্রহ্মার মাথায়, আর কৃষ্ণের মাথায় উঠেছিল চাণক্য না কার একটা টিকিওয়ালা টাক।

: তারপর ?

: তারপর আর কি—পাটক্ষেতের ভেতর দিয়ে পালিয়ে তবে প্রাণ রক্ষে! দলসুদ্ধ লোক খুঁজে বেড়াচ্ছিল আমাকে—একবার পেলে হয়। পুজোর তিনদিনে পাঁচশো টাকা বায়না নাকি ওদের লস্। গা-ঢাকা কি আর সাধে দিয়েছিলাম ?

ট্রাম থামল : লাস্ট স্টপেজ—বালীগঞ্জ।

পালিয়ে বাঁচে ব্রহ্মা আর যত রাগ ঝাড়ে আমার উপর

হাবুল ছাড়ল না, বলল : এতদূর যখন এসেছেন ছোট কাকা, আমাদের বাড়ি একবার যেতেই হবে।

পথে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম : এখন তুই কি করছিস ?

: যোগাভ্যাস। —গম্ভীর হয়ে হাবুল উত্তর দেয়।

আমিও গম্ভীর হয়ে যাই। এত অল্পবয়সে হাবুলের ও রোগ ধরল কেন ? তাছাড়া, হাবুলকে চিরটাকাল বেশ হাসি-খুশি দেখে আসছি—যোগাভ্যাস করলে তো ও গম্ভীর বাবাজী হয়ে যাবে ছ'দিনেই ! হাবুল যোগাভ্যাস করছে এ তো শুনলেও হাসি পায় ! হাসিটাকে যথাসম্ভব চেপে রেখে হাবুলকে জিজ্ঞাসা করি : কি যোগ ?

হাবুল উত্তর দেয় : অভ্যাস-যোগ।

ভাবলাম, গীতায় জ্ঞানযোগ, কর্মযোগের মতোই ওটা হবে একটা কিছু ; কিন্তু ও সম্বন্ধে—আমার পড়াশুনা নেই বেশি।

হঠাৎ হাবুল জিজ্ঞাসা করে : আচ্ছা ছোট কাকা, এমন কোনো ওষুধ পাওয়া যায় না, যা খেলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও পা দোলানো যায় ?

বললাম : দেখতে হবে কোনো ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা ক'রে।

: আজকাল তো কত রকম ওষুধই বেরুচ্ছে, দেখুন না একটিবার। এ ওষুধটা পাওয়া গেলে বোশেখ থেকেই আমি একটা চাকরিতে বাহাল হ'তে পারি—

পা-দোলানো চাকরি! অতিমাত্রায় কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করি : চাকরিটা কি ?

: রাত্রে লিচু-বাগান পাহারা দেওয়া। গাছের উপর টিন বাঁধা থাকবে একটা দড়ির সঙ্গে। নীচে থেকে সেই দড়িটায় টান দিলেই ঠন্‌-ঠন্‌ ক'রে ঐ টিন বাজবে—তাতে বাদুড়ে আর পাকা লিচু খেতে পারবে না। শুয়ে-ব'সে-ঘুমিয়ে যে ভাবে হোক্‌ দড়িটা টানলেই হ'ল।

: বাঃ, বেশ ভালো চাকরি তো !

ঃ কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, দড়ি টানতে টানতে ঘুমিয়ে পড়লে টিন আর ঠন্-ঠন্ করবে না, বাদুড়ও পালাবে না—ফলে কলুর ঘানি গাছের চাকরির মতোই এটাও যাবে।

রাত্তির ন'টা বেজে গেছে তখন। ওদের বাড়ি থেকে ফিরবার সময় দেখলাম, হাবুল তার শোবার ঘরে আড়ার সঙ্গে একটা বিস্কুটের টিন বেঁধে দিয়েছে। দড়িটার অপর প্রান্ত তার পায়ের সঙ্গে বাঁধা। হাবুল চোখ বুজে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে টিন বাজানো অভ্যাস করছে!

ধীরে-সুস্থে ও ঠাণ্ডা মাথায়

জুরাররা সবাই একমত হ'লেন যে, এ কাজ ধীরে-সুস্থে ও ঠাণ্ডা মাথায় করা নয়; কারণ, তাঁদের ধারণা, ধীরে-সুস্থে কোনোও গর্হিত কাজ করা যায় না। ওটা রাগের মাথায় হঠাৎ হয়ে যায়।

জুরার বিচারে আমরা সাত জায়গার পাঁচজন গিয়ে হাজির হয়েছিলাম কোর্টে। জজসাহেব আমাদের সঙ্গে একমত হননি। তাঁর ধারণা, এ কাজ ধীরে-সুস্থে এবং কৌশল খাটিয়ে করা হয়েছে। বরুণবাবু, অনন্তবাবু, নির্মলবাবু সারারাত্রি ধরে জজসাহেবের ধারণার সমালোচনা করলেন। আমরা সকলেই এক জায়গায় উঠেছিলাম।

এইবার ফিরবার পালা। বর্ষাকাল। ট্রেনে ফিরতে হবে, যার যেখানে বাড়ি।

রাত্তির দু'টোর সময় অনন্তবাবু বিরক্তিভরে চেঁচিয়ে উঠলেন:
—ঝঁ্যাটা মারো!

: কি হ'ল?

: আরে মশায়, শোবার আগে এক কুঁজো জল ধরে রেখেছিলাম —বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, এক গেলাস জল খেতে এলাম, দেখি কুঁজো একেবারে ঠন্ ঠন্!—কে যেন পা ধুয়ে গেছে এখানে!

রাত্তির তিনটে। সমীরবাবু ডাকলেন নির্মলবাবুকে: নির্মল, ওঠো। ট্রেন চারটেয়। আর একঘণ্টা মাত্র সময়। কিন্তু নির্মলবাবু মশারীর থেকে বেরুবার পথ পাচ্ছেন না! মাছ যেভাবে জালে আটকায়, সেইভাবে তিনি তাঁর মশারীতে আটকে পড়েছেন!

: আমার মশারীর সব দড়ি খুলে নিল কে? চীৎকার করেন তিনি।

খুলবে আর কে? দেখা গেল, কে বা কাহারা তাঁর মশারীর দড়িগুলি কেটে নিজেদের মোটঘাট বেঁধে নিয়ে গেছে।

বিছানা বাঁধতে গিয়ে বরুণবাবু একেবারে রেগে আগুন : খুন করুম। দ্যাহেন মশয়, আমার এই একেবারে নতুন হোল্ড অল কে যেন ভিজাইয়া রাইখ্যা গেছে!

জীবন সেন বললেন : এ নিশ্চয় রাত্রে বৃষ্টির সময় যারা বাইরে গিয়েছিল তাদেরই কারও কাজ।

: তারা কৈ গেল? অগ্নিশর্মা হয়ে জিজ্ঞাসা করেন বরুণবাবু।

: এতক্ষণ তারা প্রায় রাণাঘাট! হেসে উত্তর দেন জীবন সেন।

আমি আর নন্তু মজুমদার শেষ যাত্রী। আমাদের ট্রেন ভোর সাড়ে পাঁচটায়। না, আমাদের জলের কুঁজো নেই, 'হোল্ড অল'ও ছিল না। মশারীর দড়িগুলিতেও কেউ হাত দেয়নি।

হাত-মুখ ধুয়ে মশারীর দড়িতে মেলে দেওয়া গামছাখানিতে মুখ মুছতেই কি যেন মুখে লেগে গেল! ঘরে আবছা আলো-অন্ধকার। দরজার কাছে গিয়ে নন্তুকে বললাম : দ্যাখ্ দেখি মুখে কি লেগে গেল।

নন্তু আমার মুখের দিকে চেয়ে হো-হো ক'রে হেসে উঠল : করেছ কি! তোমার সারা মুখে যে কাদা।

গামছাটা খুলে দেখলাম, কে যেন বাইরের থেকে এসে পা মুছে সমস্ত গামছাখানায় কাদা মাখিয়ে রেখেছে!

ঘরে ফিরে দেখি, নন্তু ভয়ানক খাপ্পা!

কি হ'ল আবার?

অতি বিষণ্ণ মুখে সে বলল : আমার দামী নতুন জুতোটা নিয়ে কে যেন এক জোড়া ছেঁড়া জুতো রেখে গেছে!

মৈঁ চোর হুঁ

আমি তখন পাঞ্জাবে। মিলিটারী চাক্‌রি। ব্যারাকের কাছেই একটা ছোট্ট বাড়িতে থাকি। ঘর বেশি নেই—শোয়ার ঘর, স্নানের ঘর আর করিডোরের সঙ্গে একফালি জায়গায় ছোট্ট একটি রান্নাঘর। তার দরজা মাত্র একটি, জানালার বালাই নেই। ধোঁয়া উঠবার অবশ্য একটা চোঙ্‌ আছে উপরে।

বেশি ঘরের দরকারও ছিল না অবশ্য। বাসিন্দা আমি একা এবং আমার সঙ্গী—মুন্সী। মুন্সীর চাকরিটি বেশ ভালো—ঝোলে-ঝালে-অম্বলে সব তাতেই সে আছে। মুন্সী মিলিটারী ব্যারাকের নাইট গার্ড, আমার পাচক, অফিসের পিওন, বাগানের মালী এবং জল সরবরাহের লস্কর।

লোক এক হ'লেও মাইনে কিন্তু তার প্রত্যেক কাজের জন্য আলাদা। এইজন্য বিভিন্ন কাজে পোশাকও তার বিভিন্ন।

রাত্রে যখন মুন্সী চৌকী দেয়, তখন নীল পাগ্‌ড়ী প'রে রাউণ্ড দেয় আর চিৎকার ক'রে বলে: জাগতে রহো, হুঁশিয়ার। সকালে মুন্সী নীল রংয়ের হাফপ্যান্ট প'রে ঝাড়ুদার। তারপরই খাকি জামা প'রে আমার রান্নাঘরের কুক। এগারটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরেই মুন্সী আমার অফিসের পিওন। তখন তার পোশাক হচ্ছে —লম্বা সাদা জামা, মাজায় বেল্ট্‌ আর মাথায় পাগ্‌ড়ী।

সেদিন রাত্রে অসম্ভব গরম। ঘরের ভিতর থাকবার উপায় ছিল না কারও। বাইরে একটা খাটিয়ার উপর পড়ে ছিলাম। রাত্তির তখন প্রায় একটা হবে। ফাঁকা উঠোনেও গলদঘর্ম হয়ে উঠেছি গরমে। বাথরুমে গিয়ে ভিজে গামছায় গা-হাত-পা মুছে নিলাম ভালো ক'রে। বেরিয়ে আসতেই বাঁদিকে সেই রান্নাঘর। দেখলাম, শেকলটা খোলা রয়েছে। শেকলটায় অবশ্য তালা দেওয়া হয় না কোনো দিনও—কারণ ঘরে কিছুই থাকে না। মুন্সী বোধহয়

শেকলটা তুলে দিতে ভুলে গেছে মনে করে আমি শেকলটা তুলে দিয়ে আবার বাইরের সেই খাটিয়ায় শুয়ে পড়লাম এসে।

শেষ রাত্রের দিকে ঘুমের আমেজটা একটু এসেছে, এমন সময় কানে এল—কে যেন ভিতর থেকে দরজা ঠেলছে!

মুন্সী নাকি? হাঁক দিলাম: মুন্সী, কোথায় তুমি? উত্তর নেই। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই শব্দ। টর্চ নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। কোথায়ও কেউ নেই! হাক দিলাম: কোন্ হ্যায়? সাড়া শব্দ নেই।

এ সময়ে মুন্সীকে দরকার। হাক দিলাম: চৌকিদার! কোনোও উত্তর নেই।

চৌকিদার নিশ্চয় তখন ঘুমুচ্ছিল তার ঘরে। কিন্তু ঘর থেকে সে উত্তর দিলে ধরা পড়ে যাবে যে, রাত্রে সে পাহারা দেয় না। তাই বোধহয় ছুটে খানিকটা দূরে গিয়ে মিনিট খানেক পরে উত্তর দিল: বাবুজী আতা হুঁ।

কিছুটা পরেই মাথায় নীল পাগ্‌ড়ী জড়াতে জড়াতে চৌকিদার-বেশী মুন্সী হাজির হ'ল: বাবুজী, কেয়া হুয়া?

বললাম: ঘর মে চোর আয়া হ্যায়।

চোরের নাম শুনেই চৌকিদার তিন হাত পেছিয়ে গেল: কৌন ঘর বাবুজী?

রান্নাঘর থেকেই দরজায় ধাক্কার শব্দটা আসছিল ব'লে মনে হ'ল। বললাম: বাবুরচীখানা মে।

: আপকো রাইফেল কাঁহা হ্যায়?

হাসি পেল চৌকিদারের বীরত্ব দেখে। বললাম, রাইফেল কি হবে? চোর নিশ্চয় আটকা প'ড়েছে। আমি শেকল তুলে দিয়েছিলাম বাইরের থেকে।

চোর আটকা প'ড়েছে শুনে মুন্সীর বীরত্ব যেন ফিরে এল। হাতের আস্তিন গুটিয়ে মুন্সী এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে:

উল্লুক গিধড় কি বাচ্চা, তোর মুণ্ডু ছিঁড়ে দেবো, তুই কোন্ হ্যায় রে ?

কোনোও উত্তর নেই।

আমি উঠে গিয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলাম : জলদি বল কোন্ হ্যায় তুম্—

উত্তর এলো—মৈঁ চোর হুঁ।

নিজের পরিচয় এমন সঠিকভাবে কেউ দিতে পারে বলে আমার জানা ছিল না।

কেউ কম যান না

কথা হচ্ছিল চিকিৎসা সম্বন্ধে। ত্রিলোচন বলল, হঁা, চিকিৎসা যদি থাকে তবে কবিরাজী চিকিৎসা। হাতীটাকে একেবারে খাড়া করে তুললো গো।

রাজবাড়ির সেই হাতীটা। সর্দিতে হাঁস্-ফাঁস্ করছে, কত ভ্যাটারনারি, স্টেশনারি, কেউ কিছু করতে পারল না। হাতী শুয়ে পড়েছে তখন—যায়-যায় আর কি! ডাক পড়লো নেপাল কবিরাজের। নেপাল কায়কল্প চিকিৎসা করাচ্ছিলেন তখন রাজার মেশোমশায়কে। নেপাল এসে ঠুকে দিলেন এক বড়ি মহালক্ষ্মী-বিলাস এক চৌবাচ্চা পানের রস আর মধু দিয়ে—ব্যস! একঘণ্টা পরেই হাতী চড়-চড় ক'রে খাড়া হয়ে উঠল। এ তো তোমার হোমোপ্যাথী ওষুধ নয় যে, দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায় এক পয়সায় চিনি ছেড়ে দিয়ে বলবে ডায়মণ্ডহারবারের নীচে গঙ্গার থেকে সরবৎ তুলে খাও গে।

—কি বললি হোমোপ্যাথীর কথা? গোপালদা ঝংকার দিয়ে উঠলেন—যা জানিস্ না তা নিয়ে কথা বলতে যাস্ কেন? এখনকার লোকের আয়ুও নেই—বেদ মেনেও তারা চলে না; কাজেই তোর ও আয়ুর্বেদ এখন অচল। ঘরের পোষা হাতীর সর্দি লেগেছে এ তো সামান্য কথা। বনের বাঘ-ভাল্লুককে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে হোমোপ্যাথীর একটা ডোজে তা জানিস?

তবে শোন: চিড়েখানার সিংহ দেখেছিস্? সিংহ—যার মাথায় লম্বা লম্বা চুল থাকে। এয়ার রেডের ভয়ে কথা উঠল এইসব মারাত্মক অথচ মূল্যবান্ জন্তুদের কি করা যাবে? বোমা প'ড়ে চিড়েখানার ঘর-দুয়ার ভেঙে গেলে—বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার এসব জন্তুজানোয়ার তো পাগলের মতো চারদিকে ছুটতে আরম্ভ করবে, তখন উপায়?

ঠিক হ'ল বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের গুলি ক'রে মারতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, যারা গুলি করবার জন্য নিযুক্ত থাকবে, বোমা পড়লে তারা আগে পালাবে না আগে গুলি করবে? মৃত্যুভয় তো সকলেরই আছে।

তখন মিটিং করে প্রশ্ন তোলা হ'ল—মৃত্যুভয় নেই কার?

উত্তর হল—অর্বাচীন শিশুদের আর পাগলের। কিন্তু ওরা তো আর সুসংযতভাবে গুলি ছুড়ে জন্তুদের মারতে পারবে না।

আবার প্রশ্ন হ'ল—সুসংযতভাবে পরকে মারতে হাত কাঁপে না কাদের?

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করল—ডাক্তারদের।

ডাকো ডাক্তার।

অ্যালোপাথী ডাক্তাররা এসে বললেন—এসব হিংস্র পশুরাজ্যে আমাদের ব্যবসায় অচল।

তবে কি করা যায়?

বড় বড় মাথাওয়ালারা বললেন—ঘুম পাড়িয়ে রাখ। বোমা পড়ার আগেই ওদের মরফিয়া ইনজেকসন দাও।

চলল মরফিয়া ইনজেকসন।

কেবলরাম মুখফোঁড় লোক। সে অমনি জিজ্ঞাসা করে বসল—কেমন করে জ্যান্ত বাঘকে ইনজেকসন দিল?

—তোমার যেমন ঢেকিরাম বুদ্ধি!—কেন, লেজে। লোহার গরাদের ভেতর দিয়ে লেজটা টেনে ধরে ডাক্তারেরা দিল সূঁচ ফুটিয়ে।

কিন্তু কিছুই হ'ল না।

তখন ডাকো নকুলেশ্বর ডাক্তারকে।

জানালার একটা কপাট খুলে নকুল জিজ্ঞাসা করল—কে?

আজ্ঞে আমরা বড়ই মুশকিলে প'ড়ে—

—কি প্রয়োজন?

—আজ্ঞে বাইরে আসুন, সব বলছি।

জানালার ফাঁক দিয়ে বলল—বাইরে যাবার সময় নেই, আমি বিবস্ত্র। কণ্ট্রোলের কাপড় যোগাড় করতে পারিনি। যা বলতে হয় ওখান থেকেই বলুন।

ওদের সব কথা শুনে—

এক ডোজ নাম্বার থার্টি দিয়ে দিলে বুঝি?—কেবলরাম জিজ্ঞাসা করল।

একডোজ? সামালতে পারতো চিড়েখানার সমস্ত জানোয়ার নকুলেশ্বর ডাক্তারের এক ডোজ ওষুধ? একটা মলিকুল। তাও বললে—এক চৌবাচ্চা ফিলটার জলের মধ্যে একটা ছোট্ট বড়ি ছেড়ে দিয়ে—রোজ সকালে এক ফোঁটা ক'রে চৌবাচ্চার জল আহারের সঙ্গে দিতে হবে।

ব্যস! তার পরেই দেখা গেল; নাক ডেকে চিড়েখানার জন্তু-জানোয়ার, বাঘ-ভাল্লুক, সিংহ, গণ্ডার-হস্তী প্রভৃতি ঘুমুতে আরম্ভ করেছে।

বিশ্বাস না হয় একবার দেখই না নকুলেশ্বরের ওষুধ খেয়ে। এই তো কাছেই, ১৮৩নং হোঁদারাম বোসের লেনে নকুলেশ্বর ডাক্তারের বাড়ি।

হাবুল

শ্রীমান্ হাবুলকে তোমরা চেন? চেন না! হাবুল কিন্তু তা' বিশ্বাস করবে না। তার ধারণা পৃথিবীতে তাকে চেনে না এমন মানুষ নেই।

তোমরা কিন্তু হাবুলকে না চিনে ভালোই করেছ। আমার নেহাৎ গাঁয়ের লোক হাবুল—তাই তাকে না চিনে উপায় নেই। প্রতি বৎসর পূজোর সময় বাড়ি যাই। তখন হাবুলকে না হ'লেই চলে না। অথচ যত অনর্থের মূল এই হাবুল!

গ্রামের ঘাটে স্টীমার থেকে নামব। কোন্ তারিখে বাড়ি যাবো হয়তো আগে জানাতে পারিনি অথবা হয়তো জানিয়েছি কিন্তু বাড়ি থেকে কোন লোকজন এসে পৌঁছায়নি। হাবুল কিন্তু ঠিক উপস্থিত হয়েছে ঘাটে। ভাঙ্গন কূলের পাড়ে দাঁড়িয়ে সে দাঁত বের ক'রে হাসছে। বুকে বল পেলাম। সঙ্গে এতগুলি জিনিসপত্র, নামাবার একটা উপায় চাইতো—গ্রামের ঘাটে তো আর কুলী পাওয়া যায় না!

হাবুল এসে বিনা ভূমিকায় জিনিসপত্র সব নামিয়ে ফেলল। কিন্তু শেষটায় সে একটা কাণ্ড ক'রে বসবেই! হয়তো একটা ট্রাঙ্ক নিয়ে সে স্টীমারের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় জলের মধ্যে পড়ে গেল—অথবা জিনিসপত্র নামানো হ'ল, কিন্তু হাবুলকে আর নামানো গেল না—সে নামবার আগেই স্টীমার দিল ছেড়ে। হাবুল হয়তো মাঝ-নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, খালাসীর সঙ্গে মারামারি করল অথবা পরবর্তী স্টেশন থেকে পাঁচ-সাত মাইল পথ হেঁটে বেলা তিনটের সহাস্য বদনে গ্রামে ঢুকল!

পূজোর ছুটিতে আমরা সকলে গাঁয়ে গিয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়েছি। থিয়েটার হবে। রিহার্সাল চলছে। হাবুল নাওয়া-খাওয়ার সময়টুকু বাদ দিয়ে দিবারাত্র রিহার্সালের ওখানেই থাকে।

ঘর ঝাঁট দেওয়া, আলোর ব্যবস্থা করা, এটা-ওটা ফাই-ফরমাস খাটা —সব তাতেই হাবুল।

হাবুল একদিন চুপি চুপি বলল,—ছোট কাকা, আমাকে একটা চাকর-বাকরের পার্ট যদি—

উৎসাহ নিয়ে বললাম,—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

আমরা 'রিজিয়া' নাটক কচ্ছিলাম। মনে পড়ল, পরাজিত মালব-রাজের দু'লাইন পার্ট কেউই নিতে স্বীকার করেনি। হাবুলকে বললাম,—চাকর-বাকর কেন? এমন সুন্দর চেহারা তোর—আচ্ছা, তোকে একটা রাজার পার্টই দেবো!

অক্লান্ত সেবায় হাবুলের দিন যায়। রিহার্সালের শেষে সকলে যখন বাড়ি ফিরে গেছে, হাবুল তখন চুপি চুপি আমাকে মনে করিয়ে দেয়—ছোট কাকা, সেই যে ব'লেছিলেন!

হাবুলকে পার্ট লিখিয়ে দিলাম—'সদাশয় সে হেতু চিন্তিত কেন? বীর বক্তিয়ার সর্বগুণাধার।' বললাম,—তোকে রয়্যাল ড্রেস পরিয়ে দেবে। মালব-রাজার পার্ট এটা।

হাবুল মহাখুশি। সে পঞ্চাশ বার ক'রে পঞ্চাশ জনের কাছ থেকে 'টোন' 'মোসান' 'পশ্চার' সং জেনে নিল।

আসল কথাটি কিন্তু কারও মনে ছিল না। কোন্ সময়ে এবং কার পরে হাবুলের ঐ পার্ট বলতে হবে, তা তাকে ব'লে দেওয়া হয়নি। ফলে হাবুল স্টেজে উঠলে, যখন তার মুখ, কান লাল হয়ে গেল, পা ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল, তখন দর্শকেরা হেসে ফেলল। যারা হাবুলকে চিনত, তারা তাকে বক দেখাল এবং শেষটায় কম্পমান হাবুলকে বীর বক্তিয়ার স্টেজের উপর থেকে টেনে বের ক'রে আনল।

পরদিন হাবুলকে সকলে বলতে লাগল,—তুই কেন স্টেজে উঠেছিলি রে?

হাবুল বলে, আমার পার্ট ছিল যে! কেউ বিশ্বাস করে না। হাবুলের মনের দুঃখ মনেই থেকে যায়।

তার পরের বছর হাবুলকে চাকরের পার্টই দেওয়া গেল। প্রভুর ডাক শুনে 'হুজুর' ব'লে হাবুল স্টেজে প্রবেশ করবে। প্রভু তাকে নির্দেশ দেবেন, সে তা' শুনে 'যে আজ্ঞে' বলে বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু দিনরাত পার্ট মুখস্থ ক'রেও শেষটায় হাবুল গোলযোগ ক'রে বসল! প্রভুর ডাক শুনে সে—'যে আজ্ঞে' ব'লে স্টেজে ঢুকেই নিজের ভুল বুঝতে পারল। সেজন্য একবার জিভ কাটল তারপর 'হুজুর' ব'লে বেরিয়ে আসতেই শ্রোতাদের ভিতর থেকে হাততালি পড়ল প্রচুর! কেউ-বা পিছন থেকে ব'লে উঠল—ইনকোর, ইনকোর।

ঠিক করলাম, এর পর হাবুলকে আর কোনও পার্ট দেওয়া হবে না।

কিন্তু একবার 'বিল্বমঙ্গল' প্লে করতে গিয়ে দেখা গেল, মৃতদেহের পার্ট কেউই নিতে চায় না। আমরা ভেবে দেখলাম, এই পার্টটি হাবুলকে ঠিক মানাবে—কথাবার্তা কিছুই নেই, কেবল মরা মানুষের মতন চুপচাপ পড়ে থাকলেই হল!

তখনই হাবুলকে ডাকলাম। প্লে অনেকক্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে। বললাম,– পার্ট নিবি? হাবুল রাজী। বললাম,—চট্‌পট্ শুয়ে পড় এখানে,—এক্ষুণি সিন উঠবে। মনে রাখিস, তুই মৃতদেহ, মড়ার মত পড়ে থাকবি কিন্তু।

হাবুল শুয়ে পড়ল। তার পায়ের কতকাংশ থাকল উইংসের আড়ালে।

সিন উঠল। বিল্বমঙ্গল ব'লে যাচ্ছে—'এই নরদেহ, ভেসে যায়' —ইত্যাদি। ঠিক এমনি সময়ে দেখা গেল, মৃতদেহ আস্তে আস্তে তার পায়ের দিকে হাত তুলছে,—একটা সজোর থাপ্পড় মারার মতলব! সামনে যারা ছিল সকলে হো-হো ক'রে হেসে উঠল। তখনই ড্রপসিন পড়ে গেল। বিল্বমঙ্গল রেগে খাপ্পা। হাবুল বলছে, —শালা মশা কামড়িয়ে পা ফুলিয়ে দিয়েছে।

তারপর হাবুলকে নিয়ে আর থিয়েটার করিনি আমরা, করবার ইচ্ছাও ছিল না।

কয়েক বছর অতীত হয়ে গেছে। হাবুল বেশ বড় হয়েছে—ইয়া লম্বা-চওড়া জোয়ান চেহারা! আমিও বিদেশে চাকরী করি—এখন আর আগের মতো সব বছর বাড়িতে যাওয়াও হয় না।

হাবুলের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছি।

সেবার পুজোর ছুটিতে মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। অষ্টমীর দিন সকালে আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত। সেই রাত্রেই সেখানে প্রতাপাদিত্য থিয়েটার। কিন্তু তাদের রডা সাহেব খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় সকলেই বিমর্ষ। আমাকে দেখে যেন তারা হাতে স্বর্গ পেল! আমাকেই রডার পার্ট করতে হবে। তারা জানে এর আগে আমি অন্যত্র রডার পার্ট করেছি। সন্ধ্যা হ'তেই আলো জ্বেলে, স্টেজ ফিট ক'রে তারা একেবারে হৈ-চৈ কাণ্ড বাধিয়ে তুলল।

প্লে খুব জমে উঠেছে। রডা সাহেব যেন ক্ষেপে গেছে। কামান চলছে—গুড়ুম, গুড়ুম!

'যুঢ্য কর—কামান ডাগো'—রডার এই স্পীচটি শেষ হ'লে সুন্দর তাকে অনুরোধ করবে,—'সাহেব ওরা শাদা নিশান তুলেছে, যুদ্ধ থামাও।'

রডা তার কথা কানে না তুলে ভীষণ বিক্রমে শত্রুদের আক্রমণ করবে। সুন্দর তখন অনুপায় হয়ে—'তবে রে সুমুন্দি' ব'লে রডাকে জড়িয়ে ধরবে।

কিন্তু এত সব কিছুই হ'ল না! 'যুঢ্য কর, কামান ডাগো' বলতে না বলতেই বৈঠা হস্তে সুন্দর এসে অকস্মাৎ 'তবে রে ছোট কাকা' ব'লে আমাকে জাপটিয়ে ধরলে,আমার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হ'ল! সভয়ে আমি সুন্দরের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম,—সুন্দর আর কেউ নয়, আমাদেরই সেই হাবুল।

ড্রপসিন প'ড়ে গেল।

স্বেচ্ছাসেবক হাবুল

গ্রামের দত্ত-বাড়িতে কথকতা হ'চ্ছিল।

হাবুলকে বললাম,—যাবি ?

হাবুল নাক সিঁটকিয়ে উত্তর দিল,—ধ্যাৎ !

বললাম,—ঐ তো তোদের দোষ ! ধর্মকথায় তোদের মন ওঠে না, গুরুজনেরা একটা কথা বললে তাচ্ছিল্য ক'রে উড়িয়ে দিস্—এগুলোই কি তোদের প্রগতির লক্ষণ ? এই কি তোদের কালচার ?

অমনি হাবুল রাজী হয়ে গেল। এখানেই ছিল তার দুর্বলতা। একটু ঘুরিয়ে কায়দা ক'রে কোনো কথা বললেই হাবুল তার অর্থ ঠিক বুঝত না। বুঝত না ব'লেই প্রগতি, কালচার প্রভৃতি কথায় সে ঘায়েল হয়ে যেত। তাকে নরম করতে হ'লে—ফেডারেশন, বায়নাকুলার কি অ্যাটিসিপেসন যে-কোনোও একটা গালভরা কটমট শব্দই যথেষ্ট।

কথকতার আসর। একখানি উঁচু তক্তপোশের উপর বক্তা বৃদ্ধ ভট্চায্যি মশায় ব'সে আছেন। সম্মুখে বহু শ্রোতা নিবিষ্টচিত্তে তাঁর রামায়ণ কথা শুনছেন।

ভট্চায্যি মশায় বলছিলেন,—এস এস বাছা পবননন্দন,—ঐ পাশের বাড়ির বৈঠকখানা থেকে পাঁজীখানা নিয়ে এস তো বাপ !

কথক রসিক। তাঁর আখ্যানের কোনও জায়গায় বোধহয় ভালো দিন দেখে একটা কিছু করান হচ্ছে।

কিন্তু পিছনে ফিরে দেখি, হাবুল নেই। সম্ভবতঃ সে লোকের ভিড় দেখে অথবা তার ভালো লাগেনি ব'লে আমাকে না জানিয়েই সরে পড়েছে।

কথকতা যথারীতি চলছে: তারপর হনুমান উপস্থিত, সঙ্গে জ্যোতিষী। তিনি গণনা ক'রে বললেন,—আজ থেকে তের দিনের মধ্যে মেঘনাদের একটা মৃত্যুযোগ আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আখ্যানভাগ জমে উঠেছে। এইবার মেঘনাদের নিকুম্ভিলা যজ্ঞ শেষ হওয়ার আগেই লক্ষ্মণ তাঁকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবেন।

ঠিক এমনি সময়ে শ্রীমান্ হাবুল পাশের বাড়ির বৈঠকখানা থেকে একখানা পাঁজী এনে কথকঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত!

হাবুল কাহিনীটা গোড়া থেকে শোনেনি এবং পবননন্দন কথাটির অর্থ নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি। সে মনে করেছিল, তাকেই পাঁজী আনবার জন্য কথকঠাকুর বলছিলেন!

হাবুলকে হঠাৎ পাঁজী আনতে দেখে উপস্থিত শ্রোতাগণ হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, যে কাজেই হাবুলকে সঙ্গে নিয়ে যাবো—শেষ পর্যন্ত সে একটা কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করবেই।

তা করুক। হাবুলের বুদ্ধি একটু কম থাকলেও তার উৎসাহ ছিল প্রচুর। তা না হ'লে বারোদোলের মেলায় আহার-নিদ্রা ছেড়ে তার মতো কে খাটতে পেরেছে?

রাজার চকে প্রতি বছর চৈত্র-সংক্রান্তির দিন থেকে বিরাট মেলা ব'সে থাকে। আট-দশ দিন চলে এই মেলা। দিনের বেলায় খুব রোদ থাকে ব'লে রাত্রি বেলাতেই লোকজনের সমাবেশ হয় বেশি। মেয়েরাও এই মেলায় জিনিসপত্র কিনতে আসেন।

'বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার কোর' নাম দিয়ে এখানে একটা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হ'য়েছে। বুঝলাম, সংস্কৃতি, ডোমিনিয়ন, স্ট্যাটাস প্রভৃতি হাবুলের দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করে কে যেন তাকে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে।

হাবুল খাটছে। দিন নেই, রাত নেই—আহার নেই, নিদ্রা নেই, হাবুল অক্লান্তভাবে ভলাণ্টিয়ারী ক'রে যাচ্ছে। দিন কয়েক পরে শুনলাম হাবুলকে কমাণ্ডার করা হ'য়েছে। হাফ্‌প্যাণ্ট ও শার্ট—তাতে কমাণ্ডারের ব্যাজ, গলায় সুতো-বাঁধা হুইসেল, হাতে স্টিক্—হাবুল তার দলবল নিয়ে মেলার শান্তি রক্ষা ক'রছে।

তার শেষ-রক্ষা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও ব্যাপারটা যে এত দূর গড়াবে তা' আমি ভাবতে পারিনি।

বড়দার শ্যালক ধীরেনবাবু কলেজের প্রফেসার। খুব নিরীহ ভদ্রলোক। বারদোল উপলক্ষে তাঁদের বাড়ি থেকে ছেলেমেয়েদের মেলায় নিয়ে এসেছেন। আমারই কথা ছিল তাদের মেলা দেখিয়ে আনবার; কিন্তু বিশেষ জরুরী কাজ থাকায় আমি যেতে পারিনি। অগত্যা ধীরেনবাবুই তাদের নিয়ে মেলায় গিয়েছিলেন। রাত্রিকাল। জ্যোৎস্না রাত্রি। মেয়েরা কি সব কিনছেন দোকান থেকে। ধীরেনবাবু ভিড়ের মধ্যে না গিয়ে দূর থেকে তাদের দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়ে আছেন।

এটা কমাণ্ডার হাবুল চন্দোয়ের নজর এড়ালো না। সে ভাবল মেয়েদের দিকে লোকটি যখন বারবার তাকাচ্ছে—এমন কি দূর থেকে যখন তাদের 'ফলো' করছে তখন নিশ্চয়ই সে চোর বা বদমায়েশ। তারপরের অবস্থা কি হল তা না বললেও সকলে বুঝতে পারবে! কারণ হাবুল যেখানে কমাণ্ডার সেখানে শেষ পর্যন্ত একটা কেলেঙ্কারী হবেই!

হাবুল হুইসেল দিয়ে তার দলবলকে জড়ো করল, পুলিশ যে ভাবে ফেরারী আসামী কি চোর-গুণ্ডাকে ধরে সেইভাবে ধীরেন-বাবুকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল, তাঁকে অপমান করল; কিন্তু তাঁবুতে ধরে এনে তাঁর সবিশেষ পরিচয় পাবার পর ঐ যে হাবুল গা-ঢাকা দিল, তারপর দশদিনের মধ্যে তার কোনও খোঁজ খবর পাওয়া যায় নি।

হাবুলের আস্ফালন

বাড়িতে একটা বিবাহ উপলক্ষে মেজদিকে আনবার জন্য লোক পাঠানো হয়েছিল। লোক ফেরত এসেছে। মেজদিকে পাঠায়নি। মা কাঁদছেন। তাঁর বড় মেয়ে, ছোট মেয়ে এবং নাতি-নাতনীরা সকলেই এসেছে, আসেনি কেবল তাঁর মেজ মেয়ে। সব ক'টিকে এক জায়গায় দেখা বুঝি তাঁর ভাগ্যে আর ঘটল না!

আনন্দ-সম্মেলনে সকলের এই নিরানন্দ মনোভাব আমাকে সজাগ করে তুলল। আমি নিজেই চললাম মেজদিকে আনতে। হাবুলকেও ডাকতে হল। সব কথা বলে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আনতে পারবি মেজদিকে? সে দৃঢ়স্বরে বলল, আলবাৎ। কিন্তু ট্রেন তো চলে গেছে সেই কখন। হেঁটেই যাবো,—উত্তর দেয় হাবুল।

মাইল তিন চার গিয়ে সম্মুখে পড়ল একটি ছোট নদী। খেয়া-নৌকা ওপার। হাবুল মাঝি মাঝি বলে চিৎকার করে গলা ভাঙ্গল—কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। হাবুলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। কাপড় গুটাতে গুটাতে দৃঢ়-মুষ্টি তুলে ওপারের অদৃশ্য মাঝিকে হাবুল বলল,—র‍্যাস্কেল স্কাউণ্ড্রেল—আজ তোমাকে দেখে নেবো। তোমার ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবো।

ছোট নদী। হাবুল সাঁতরিয়ে ওপারে যাবে। কিন্তু একহাঁটু জলে নামতেই তার পায়ে বাধল্ একটা দড়ি! এই দড়ির সঙ্গে ওপারের খেয়া-নৌকা বাঁধা। বুঝলাম, পাটনী সব সময় থাকতে পারে না বলেই নদীর দু'কূলে এরূপ দড়ির ব্যবস্থা আছে।

হাবুলের মুষ্টি-নিক্ষেপ আর আস্ফালন বৃথাই গেল।

নদী পার হয়ে আমরা চলে এসেছি অনেক দূর। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। অপরিচিত গাঁয়ের নির্জন পথ। একজন লোক লম্বা লাঠি ঘাড়ে ক'রে আমাদের দিকেই আসছে। হাবুল হঠাৎ থেমে বলল,—কাকা দাঁড়ান্!

ঃ কেন ?

হাবুল চুপি চুপি বলল,—দেখতে পাচ্ছেন না, ওরা ডাকাত। তখন বলেছিলাম, লাঠিটা নিয়ে যাই—তা আপনি কিছুতেই রাজী হলেন না।

কথা শেষ করেই হাবুল তাড়াতাড়ি একটা গাছের মোটা ডাল ভেঙ্গে নিল। ডাল হাতে নিয়ে হাবুল সম্মুখদিকে তাকিয়ে বলল,—দেখলেন, ডাল ভাঙতে দেখে ভড়কে গেছে! পাশ কাটালো ডাকাতটা! পিছন থেকে আসবে মনে করেছে।

হাবুলের মাথায় চট্ করে একটা বুদ্ধি এলো। বলল, ছোট কাকা, আপনি চলুন সম্মুখে তাকিয়ে, আর আমি চলব পিছনে তাকিয়ে—দুজনের পিঠ থাকবে এক জায়গায়। দেখি বেটারা পিছন পায় কোথায় ?

খানিকটা দূর এইভাবে যাওয়ার পর হাবুল বলল, ঠিক ধরেছি। দেখুন ঐ পথেই এবার আসছে।

আমরা দাঁড়ালাম।

আমাদের দাঁড়াতে দেখে দূরের একটি লোক জিজ্ঞাসা করল—কারা যায় ? হাবুল গাছের ডালটি শক্ত করে ধরে উত্তর দেয়, তা দিয়ে তোমার দরকার ? কি চাও তুমি ? মতলবখানা কি তোমার ? কাছে এলে মুণ্ডু ছিঁড়ে দেবো।

: একটা বাছুর দেখেছেন আপনারা ? গাইটা গোয়ালে ঢুকেছে, কিন্তু সঙ্গে বাছুর নেই।

লোকটিকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কে রে, তারক নাকি ?

: ও! তুমি কেদার!

তারকনাথ আমাদের সঙ্গে গাঁয়ের মাইনর ইস্কুলে পড়ত। সব কথা জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, গাঁয়ের নাম রাধাভাঙ্গা,—ওখানেই তারকের বাড়ি।

তারকনাথের বাড়িতেই সে রাত্রি আশ্রয় নিতে হ'ল। হাবুল কিন্তু তারককে সেই চ্যালেঞ্জ করার পর আর তার সাথে ভালো করে কথাই বলতে পারেনি।

সকালেই আবার আমরা পথে বেরিয়ে পড়লাম। মেজদির বাড়ির কাছে এসে হাবুলকে বললাম, হ্যাঁরে যদি মেজদির শ্বশুর বলেন, পাঠাবো না ?

: বললেই হল।

: কি করবি ?

: বুড়োর মাথা—

: দূর গাধা—

: মেজ পিসীমাকে বলব, চলে এসো।

ঃ তাই কি হয় ?

হাবুল কিছুক্ষণ চুপ্ ক'রে কি যেন ভাবল। পরে বলল, খাবো। খেয়েই ওদের হাঁড়ি সাবাড় ক'রে দেবো।

: তাতে মেজদির আসার কি সুবিধা হবে ?

হাবুল কিছুই বুদ্ধি স্থির করতে পারল না। ভেবে-চিন্তে কোন কিছু করা তার কোষ্ঠিতে নেই! রাত্রে তাদের যথাসর্বস্ব চুরি করবে, ঘরে-আগুন লাগাবে, মারামারি করবে এই রকম কত কি সব বলতে বলতে হাবুল পথ চলতে লাগল। হাবুল যে রকম চটেছে, ভয় হল কুটুম্ব বাড়ি গিয়ে সে একটা অনর্থ না ঘটায়।

মেজদির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম—গাড়ি উপস্থিত। মেজদির শ্বশুরমশায় নিজেই মেজদিকে নিয়ে এসে সকলকে ডাক লাগিয়ে দেবেন ব'লে লোক ফিরিয়ে দিয়েছিলেন! আমাদের দেখে বললেন, —আবার তোরাও এসেছিস ? নে তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। ট্রেনের খুব দেরি নেই।

আমি তাঁকে প্রণাম করলাম। হাবুলও তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, হে হে, আপনিও যাবেন। তার আস্ফালন বৃথাই গেল।

ব্যবসায়ী হাবুল

সেদিন হাবুলকে দেখলাম যজমান বাড়ি পুজো করতে ছুটছে। ছুটছে বলছি এইজন্য যে, তখন তার কথা বলবার সময় নেই। চন্দনী মিস্তির-বাড়ি পুজো ক'রে যেতে হবে ধূলজুড়ি বোসেদের বাড়ি। তারপর চাঁদয়ার বাড়ুয্যে বাড়ি, সেখান থেকে গোপালপুর সরকার-বাড়ি।

কিন্তু সেজন্য ভাবনার কোনও কারণ নেই। হাবুল হাফপ্যান্ট পরে সাইকেলে ছুটছে। তার গলায় নামাবলী জড়ানো। সাইকেলের একদিকে হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে বাঁধা হারিকেন। আর একদিকে একটি ঘণ্টা! বললাম: একটা সাইকেলের 'বেল' কিনে নিলেই তো পারিস।

ঃ কিন্তু সে ঘণ্টা বাজিয়ে তো পুজো করা যায় না! উত্তর দেয় হাবুল। অনেক বাড়িতে পুজো করতে ব'সে ঘণ্টাই পাওয়া যায় না। এটায় দু'কাজই হবে।

বুঝলাম, যজমানী ব্যবসায়ে হাবুল পসার করতে পারবে।

হাবুলের পৈত্রিক যজমানগুলি এতদিন অক্ষয় ভট্‌চায্যি মশায় চালাচ্ছিলেন। কিছুদিন আগে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় হাবুল নিজেই পুজো করছে।

সেদিন মহেশ দত্তের বাড়িতে হাবুল মন্ত্র পড়াচ্ছিল—'অক্ষয় স্বর্গকাম 'অহং' ইত্যাদি। মহেশের শাশুড়ী অক্ষয়ের নাম শুনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল ও নাম আর কেন ঠাকুরমশায়, এখন আপনার নামেই স্বর্গকাম করুন।

হাবুল মন্ত্র পড়তে গিয়ে একদিন ব'লেছিল, 'ইদং ব্রত-দান-কর্মং অহং করিষ্যাম', তারপর হ'তে ছেলেরা হাবুলকে বিদ্যাদিগ্‌গজ উপাধি দিয়েছে। তারা হাবুলকে দেখলেই জিজ্ঞাসা করে: ঠাকুর-মশায় বলুন তো কর্মন শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে কি হয়?

হাবুল পথে এসে দাঁত কিড়মিড় করে বলে, এসব এঁচড়পক্ক ছেলে কি কখনও পরীক্ষায় পাশ করবে ?

এর অনেকদিন পরে হাবুলের সঙ্গে দেখা। মস্তবড় একটা কাঁঠালের ডাল ঘাড়ে করে যাচ্ছে সে। জিজ্ঞাসা করলাম, কে রে, হাবুল নাকি ?

হাবুল ডালটি নামিয়ে রেখে হেসে বলল, হে হে, ছোট কাকা, একটা ব্যবসা আরম্ভ করেছি কিনা তাই—

: ব্যবসা ! পণ্ডিত হাবুলচন্দোর বিদ্যাদিগ্‌গজ ব্যবসা করছে ?

: যজমানী ক'রে আর সংসার চলে না আজকাল।

: তা সত্যি। এখন কি ব্যবসা ধরেছ ?

: মাথায় একটা বুদ্ধি এল ছোট কাকা। ভেবে দেখলাম, ছাগলের ব্যবসাটা মন্দ না। একটা ছাগল বছরে দু'বার বাচ্চা দেবে। ধরুন, ছত্রিশ টাকা দিয়ে আমি তিনটে ছাগল কিনেছি। এদের তিনটে করে বাচ্চা হ'লে দু'বারে এক বছরেই মোট আঠারটা বাচ্চা হবে। এক বছর পরে এই আঠারটা থেকে পঞ্চাশটা, তার পরের বছর একশোটা। তা হ'লে দু'বছর পরে দেখা যাচ্ছে, ছত্রিশ টাকায় আমার ন'শো টাকা লাভ।

হাবুল লাভ-লোকসান বুঝতে শিখেছে মনে হ'ল। বললাম, এটাই তা হলে চালিয়ে যা !

প্রায় মাস চারেক পর একদিন দেখি হাবুল একটা বর্শা হাতে নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! কি ব্যাপার ? শুনলাম, হাবুলের ছাগলের বাচ্চা রোজ রোজ শিয়ালে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। শিয়ালকে সে নির্বংশ করে ছাড়বে কিন্তু সারাটা বন তন্ন তন্ন করেও সে শিয়ালের দেখা পাচ্ছে না !

এর কিছুদিন পরে দেখলাম, হাবুল কচুর পাতায় করে চিটে গুড় নিয়ে যাচ্ছে। হাবুলের ছাগলের পেটে অসুখ হয়েছে—বাঁশের পাতা আর চিটে গুড় খাওয়ালে নাকি পেটে অসুখ সারে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের বৈঠকখানা ঘরে বসে আছি। হাবুল এসে জিজ্ঞাসা করল, ছোট কাকা, চার পেয়ে সাপ কোথায় পাওয়া যায় জানেন? বললাম,—তোর মাথা খারাপ হয়েছে নাকি হাবুল! সাপের আবার কোনদিন পা হয় নাকি?

হাবুল অবাক হয়ে বলল, হয় না? তবে যে ওপাড়ার এস্রাজ মিয়া বলে গেল, চারপাওয়ালা কেউটে সাপ ঘাসের সঙ্গে খাওয়ালে ছাগলের কেউটি রোগ সারবে?

: কেউটি আবার কি রোগ? কোনদিন তো ওরকম রোগের নাম শুনিনি!

হাবুল বলল, সমস্ত গায়ে চাকা চাকা হ'য়ে ছাগলের গায়ের লোম উঠে যাচ্ছে।

বললাম, কেউটি-মেউটি বুঝি না। তুই বরং সদরে গিয়ে পশু-চিকিৎসক ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আয়।

হাবুল পরামর্শ মত কাজ করল কিনা জানি না, তবে মাস দু'য়ের মধ্যেই তার এই লাভের ব্যবসা অনেক লোকসান করিয়ে উঠে গেল!

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে শুনলাম, হাবুল অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে।

বললাম, তারপর, হাবুলচন্দোর কি খবর?

হাবুল গম্ভীর মুখে বলল, বিদেশে চলে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে খুব একটা জরুরী কথা ছিল।

: বিদেশে কেন?

: ব্যবসা করব। ঘরে বসে থাকা আর ভালো দেখাচ্ছে না। পিসীও দিনরাত ঘ্যান ঘ্যান করে।

: ব্যবসা করবে, তা বেশ ভালো! কথায় বলে, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। তা মূলধন পাবে কোথায়? ছাগলের ব্যবসায়ে তো শুনলাম অনেক টাকা লোকসান দিয়েছ!

হাবুল বিজ্ঞের মত উত্তর করল, মূলধন দরকার হবে না। মাত্র একটি টাকা নিয়েই এই ব্যবসা আরম্ভ করা যাবে।

মূলধন না থাকলেও ব্যবসা করা যায় তা জানতাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যবসাটা কিসের বল তো?

হাবুল মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, আজ্ঞে কথাটা একটু গোপনে—

: আচ্ছা। কেষ্ট বাঁড়ুয্যে আর শিবেন তাস খেলবে ব'লে এসেছিল। তাদের বললাম, তোমরা একটু বস ভাই। তারপর হাবুলকে নিয়ে বাইরের বকুল তলায় গিয়ে বসলাম।

হাবুল বলল, আমার প্ল্যানটা শুনুন ছোট কাকা। এক টাকায় কুড়িটা তামার ছোট মাদুলী পাওয়া যায়। অব্যর্থ ওষুধ বলে এই কুড়িটা মাদুলী যদি বিনা মূল্যেও বিতরণ করা যায় তাহ'লে কেবলমাত্র মাদুলীর দাম দশ পয়সা হিসাবে নিলেই টাকায় এক টাকা লাভ। তারপর সেই মাদুলীর মধ্যে একটা শক্ত কাগজে লাল কালী দিয়ে যদি কোনও দেবস্থানের ঠিকানা দিয়ে রাখা যায়, তাহ'লে খদ্দেরকে বলা যেতে পারে,—অসুখ সেরে গেলে ঐ মাদুলীর মধ্যে যে ঠিকানা পাবে, সেই ঠিকানায় পাঁচসিকে বাবার পূজোর জন্যে পাঠিয়ে দিতে হবে।

তাহ'লে ধরুন, কুড়িটা মাদুলীর মধ্যে যদি দশটাও অসুখ ভালো করে দেয়, তা হ'লে আবার সাড়ে বারো টাকা লাভ।

: কিন্তু এই দশজনের মধ্যে সবাই যে মনিঅর্ডার করে টাকা পাঠাবে তা তো নয়!

: ধরুন, এদের মধ্যে চার পাঁচজন কিছুই পাঠালো না তা হলেও তো পাঁচ ছয় টাকা লাভ হবেই।

হিসাবে কিছুমাত্র ভুল নেই। বুঝলাম, ব্যবসায় বুদ্ধিতে হাবুলের মাথা বেশ খুলেছে। বললাম, তারপর?

হাবুল বলল, আমি দেশে দেশে ঘুরে মাদুলী বিতরণ করব। আর টাকা আসবে এখানে একটা নতুন ঠিকানায়। পোস্টঅফিসে

ব্যবস্থা ক'রে আপনাকে সে টাকা নিতে হবে। এ উপকারটুকু আপনার না করলেই হবে না। তারপর ব্যবসা একবার দাঁড়ালে নিজেই অফিস-টফিস খুলে একটা ব্যবস্থা করে নেবো।

বললাম, বেশ, মাতুলীর ভিতরে নতুন ঠিকানাটা কি হবে লিখে দাও। আমি পোস্টঅফিসে জানিয়ে রাখছি—ঐ ঠিকানার চিঠিপত্র, মনিঅর্ডার সব এখানেই দেবে।

লাল কালী দিয়ে হাবুল লিখেই এনেছিল :

'শ্রীশ্রীগাব কালী শরণং

বাবার চরণ ভরসা।

সেবাইত—শ্রীতারিণীচরণ বিদ্যাজলধি

পোঃ আন্দুল বেড়ে, জেলা—নদীয়া।

স্বপ্নাদ্য মাতুলী। ইহা ধারণ করিলে সর্বপ্রকার ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করা যায়। মকদ্দমায় জয় হয়, পরীক্ষায় পাশ হয়। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত এই মাতুলীর ঔষধ বিনামূল্যে—কেবল দশের ও দেশের হিতের জন্য বিতরণ করিবার আদেশ আছে। অসুখ সারিলে বা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে বাবা-স্থানে মাত্র পাঁচসিকা মানত উপরের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। না পাঠাইলে বাবার রোষাগ্নির জন্য সেবাইত দায়ী নয়।'

মাতুলীর বিবরণ ও ঠিকানা দিয়ে হাবুল চলে গেল। মাস দুই পরে বাবার চরণ-ঠিকানা নিয়ে একখানি চিঠি এলো, তাতে লেখা ছিল : মহাশয়, আপনার মাতুলী ধারণ করিবার পর অসুখ ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছে। কি মাতুলী দিলেন জানি না। পত্রপাঠ উল্টো মাতুলী পাঠাইয়া দিবেন।

কয়েকদিন বাদে আর একখানি পত্র এলো। তাতে ধমক দিয়ে লেখা হ'য়েছে : মকদ্দমায় হারিয়া গিয়াছি। বড় আশা করিয়া মাতুলী লইয়াছিলাম। পত্রপাঠ আমার মামলার সমস্ত খরচা পাঠাইয়া দিবেন, নতুবা আপনার নামেই মামলা আনিব।

পিওন এলে মনিঅর্ডার পাওয়ার কথাই মনে হয়। আরও কিছুদিন পরে একখানি পত্র এলো। তাতে লেখা ছিল :

আপনার মাদুলী তামাম ফল্‌স্‌; শয়তানী করিবার আর জায়গা পান নাই। আমি অঙ্কে তিন, বাংলায় নয় ও ইংরেজীতে সাত পাইয়া ফেল করিয়াছি। মাদুলী ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি—হাতের কাছে পাইলে আপনার মুণ্ডুটিও ছিঁড়িয়া ফেলিতাম।

কিছুদিন পরে হাবুলের পত্র এলো। লিখেছে : ছোট কাকা, মনিঅর্ডার কতগুলি পেলেন? ঐ টাকা থেকে পত্রপাঠ আমাকে কুড়িটি টাকা পাঠিয়ে দেবেন। এখানে বাজারের একটা দোকান ঘরে জ্বর হ'য়ে প'ড়ে আছি। আপনার টাকা এলে বাড়ি রওনা দেবো।

আমার দীর্ঘ ছুটি ফুরাতে তখনও দশদিন বাকী। ভাবলাম, আর নয়, পিওনের কাছে খবর নিয়ে হয় তো আমার মুণ্ডুটাও ছিঁড়ে ফেলতে পারে কেউ। সেই দিনই আমার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হাবুলকে টাকা মনিঅর্ডার করে নিজের কর্মস্থলে ফিরে এসেছি। শ্রীশ্রীগাব কালী হাবুলকে রক্ষা করুন।

সিদ্ধি ও সূক্ষ্মভাব

একবার পূজোর সময় আমরা ক'জন মিলে সিদ্ধির সরবৎ খেয়েছিলাম। ক'দিন খাটাখাটনিতে শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ কচ্ছিল। ওবাড়ির জনার্দন বলল, সিদ্ধির সরবৎ খেলে শরীরটা বেশ ঝরঝরে হ'য়ে যায়। মন্টু জিজ্ঞাসা করল, সেটা আবার কি? জনার্দন বুঝিয়ে দেয়: সিদ্ধি মানে ভাঙ্। মহাদেব যা খেতেন। একরকম ছোট ছোট গাছের শুকনো পাতাকে বলে সিদ্ধি। মন্টুর সন্দেহ যায় না। জিজ্ঞাসা করে, গাঁজা?

: দূর গাঁজা হবে কেন? দেবাদিদেব মহাদেব কি গাঁজা খেতেন নাকি? তবে ভাঙ্ গাছের মতই দেখতে ওগাছ। তুলসী গাছে যেমন মঞ্জরী হয় গাঁজা গাছেরও তেমনি মঞ্জরী বেরোয়। ওটাকে তামাকের মত ক'রে গাঁজাখোরেরা কল্কেয় সেজে খায়। ওগাছ কা'রও বাড়িতে হ'লে রক্ষা নেই, পুলিশে এসে ধরবে। ওর আবাদ করতে হ'লে লাইসেন্স লাগে।

জনার্দন সিদ্ধির শুকনো পাতা যোগাড় করে, বেটে, দুধ চিনি, বাদাম পেস্তা আর কি সব দিয়ে আমাদের সরবৎ করে দিল। বেশ লাগল খেতে। কিন্তু তার কয়েক ঘণ্টা পরেই সিদ্ধির প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'য়ে গেল!

একটা ফুটবল খেলা ছিল সেদিন। যথারীতি খেলা আরম্ভ হ'লে দেখা গেল, মন্টু পাঁচ নম্বর ফুটবলটি ছেড়ে দিয়ে একটা সূক্ষ্ম বলের উদ্দেশে সমস্ত মাঠ ছুটোছুটি করছে। মানু নাকি একটার বদলে গোটা চার-পাঁচ বল দেখছিল মাঠে! ফলে সে সব কটির পিছনেই ছুটেছে, অথচ একটাতেও পা ছোঁয়াতে পারেনি! দীপক নদীর ওপারে গিয়েছিল কি একটা কাজে, ফিরবার সময় জলের উপর নৌকোর ছায়াকে নাকি সে ডাঙ্গা মনে করে নামতে গিয়ে একেবারে নদীর মধ্যে! ভাগ্যে সে ভাল সাঁতার জানত, নতুবা সিদ্ধির জের কতদূর গড়াতো কে জানে! ওদের কাণ্ড-কারখানা দেখে আমার

কেবল হাসতে ইচ্ছে করছে। হঠাৎ মনে পড়ল, চাকরীর ইনটার-ভিউয়ের জন্য আমার ডাক পড়েছে। পরদিনই যেতে হবে। ভাবলাম, চুলটা ছেঁটেই যাই। রাখাল পরামাণিক নাকি ভাল চুল ছাঁটতে পারে।

বিকালেই রাখালকে ডাকলাম: ত্যাখ, একটু ভালো করে চুলটা ছেঁটে দে দেখি। ঘাড়ের কাছটা মিলিয়ে দিতে পারবি তো? না কাক-ঠোকরান করে দিবি?

: একটি একটি ক'রে চুল মিলিয়ে দেবো দা'ঠাকুর—হাঁ, এ রাখাল পরামাণিক। সূক্ষ্ম কাজ আর কোথায়ও এমন পাবেন না।

রাখাল চুল ছাঁটছে। ব'সে ব'সে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল। হ্যাঁরে কত দেরি? চিরুণী ছেড়ে আবার রাখাল সূক্ষ্ম কল নিল। আবার মোটা চিরুণী, তারপর সরু চিরুণী। আবার কল!

: হ্যারে হ'ল? কতক্ষণ ধরে ছাঁটবি চুল?

: ব্যস্ত হবেন না দা'ঠাকুর—এসব তাড়াহুড়োর কাজ নয়, শিল্প কাজ।

শিল্প কাজ যখন শেষ হ'ল তখন মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম, সর্বনাশ! সমস্ত মাথাটি কদম ফুলের মতন করে এনেছে রাখাল! আমার কান্না পেয়ে গেল।'

হঠাৎ মনে পড়ল, রাখালও সিদ্ধির সরবৎ খেয়েছিল আমাদের সঙ্গে! ওকে আর বকে কি লাভ হবে এখন? যা হবার তা তো হ'য়েই গেছে! সারা গায়ে-মাথায় আমার চুল। সেগুলি ঝাড়ছি তো ঝেড়েই যাচ্ছি। রাখাল বলল, দা'ঠাকুর আপনার চোখ দুটো একটু লাল হয়েছে কিন্তু—

রাগ ক'রে বললাম,—শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকতে হবে না। কাল আমার ইনটারভিউ—কি ক'রে তাঁদের সামনে এই কদমফুল-ছাঁটা মাথা নিয়ে দাঁড়াবো বল্ তো?

মেজ কাকা হঠাৎ উপস্থিত। বললেন,—কি বল্লি? তোর আবার ইনটারভিউ কিসের? সে তো তোর দাদার!

তুইও বুঝি খুব খানিক সিদ্ধির সরবৎ খেয়েছিলি?

বুদ্ধির্যস্য

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ওদেশটা ছিল ইংরেজদের অধীনে। স্বাধীন হওয়ার জন্য যখন আমেরিকাবাসীরা নানা রকম সভা-সমিতি, সেচ্ছাসেবক গঠন, পিকেটিং ইত্যাদি করছিল, তখন শাসনকর্তারা বিজ্ঞাপন দিলেন: 'নতুন ক'রে কেউ আর সভা আহ্বান করতে পারবে না।'

মুস্কিলের কথা!

সভা করে দেশের লোককে তাঁদের কর্তব্য বুঝিয়ে না দিলে একমত হয়ে কি ক'রে কাজ হবে?

কিন্তু আমেরিকা-বাসীদের মধ্যে তখন খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী লোক ছিলেন। তাঁদের মাথায় চট্ করে বুদ্ধি খেলে গেল। তাঁরা বললেন—'কুচ পরোয়া নেই। মিটিং চালাও। প্রত্যেক মিটিংয়ের শেষের একটা বিষয় থাকবে পরের মিটিংয়ের জন্য এবং সেদিনের মিটিংয়ের একটা বিষয় আবার ফেলা হবে পরবর্তী মিটিংয়ের জন্য।'

এইভাবে ঠিক আগের মতই সভা চলতে লাগল। পুলিশ এসে খুব চোখ রাঙালে; কিন্তু আইনে তারা পেরে উঠল না। প্রত্যেক সভাকেই বলা হল এটা নূতন সভা নয়—আগের সভারই মুলতুবী বিষয়ের আলোচনার জন্য এই সভা (Adjourned meeting).

সুতরাং সভা আর 'নূতন হল না সত্য—কিন্তু সভার কাজ যা, তা পর পর ঠিকই চলে আসতে লাগল; পুলিশ এবং রাজশক্তি থাকল বোকা হয়ে।

হিটলার আইন করে দিলেন যে, জার্মানী থেকে কোনও অর্থ নিয়ে কেউ বাইরে যেতে পারবে না।

এই সময়ে জার্মানীর রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন,—কখন কি

হয় বলা যায় না। কাজেই বহু ধনী হিটলারের এই বিধান এড়াবার জন্যে নানা রকম ফন্দী করতে লাগলেন।

জার্মানীর কোনও ধনী লোক এই সময়ে ব্যাঙ্ক থেকে হঠাৎ একদিন তাঁর সমস্ত টাকা তিনি তুলে ফেললেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল, তিনি তাঁর মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতি তৈরি করতে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ভদ্রলোক গাড়িখানি নিয়ে একদিন দেশ-ভ্রমণে বেরুলেন। সীমান্ত পার হওয়ার সময় পাহারাওয়ালা তাঁর গাড়িখানি তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে কোথায়ও টাকাকড়ি কিছু পেল না। কতকগুলো মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতি তেলকালি মাখা অবস্থায় পড়ে ছিল তার মধ্যে কিন্তু এগুলো যে বহুমূল্য প্লাটিনাম দিয়ে তৈরি তা আর কি করে তারা জানাবে? ধনী লোকটি হিটলারী আইনের চক্ষে ধূলি দিয়ে বিদেশের ব্যাঙ্কে জমা রাখলেন বহু সহস্র টাকা।

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় রাজমিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী, কামার, কুমোর, দরজী সকলকেই নামতে হ'য়েছিল যুদ্ধে।

এইরকম একজন সৈনিক বন্দী হ'য়েছিল বিপক্ষের হাতে। বিপক্ষীয়দের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্ জানতে পারলেন, বন্দীটি খুব নাম করা একজন দরজী। তিনি তাঁকে তাঁর পোশাক তৈরি করতে দিলেন। পোশাক তৈরি হ'ল। কিন্তু কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ্-এর ব্যাজও লাগাতে হবে ওই পোশাকে। এল ব্যাজ, বোতাম ও টুপি।

কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্ মাঝে মাঝে দরজীর ঘরে আসেন এবং তাঁর গায়ে ঐ পোশাক কেমন ফিট করলো দেখে যান। পোশাকটি তাঁর খুবই পছন্দসই হ'য়েছে। পরদিন পোশাকটি দিয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু সেই দিনই সন্ধ্যার দিকে দেখা গেল, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্ বেরিয়ে যাচ্ছেন বন্দীশালার দরজীর ঘর থেকে।

চীফকে দেখলে অধীন সৈন্য এবং প্রহরীদের স্যালিউট দেওয়া নিয়ম। ক্যাপ্টেন হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এসে ক্যাপ্টেনী কায়দায় প্রহরীদের হুকুম দিলেন, স্ট্যাণ্ড অ্যাট ইজ—রাইট টার্ন, স্যালিউট!

কম্যাণ্ডার-ইন চীফও ঠিক কম্যাণ্ডারী কায়দায় তাঁর কপালে ডান হাতের চারটে আঙুল ছুঁইয়ে গট্ গট্ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন দেখা গেল, সে বন্দী দরজী নেই, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্-এর পোশাকও উধাও!

কেনাই দারোগা

কেনাই দারোগা হয়েছে।

সেই কেনারাম, যে সাধন পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়া ধরবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কোনও ছলে বেরিয়ে যেত আর ছুটির পর ফিরত!

জিজ্ঞাসা করলাম,—কিন্তু বল্ তো ভাই, চাকরীটা বাগালি কি করে? কেনারাম তার দক্ষিণ বাহু প্রসারিত ক'রে বলল, বাহুবলং!

জিজ্ঞাসা করলাম, আর?

: কপালং। তা' না হ'লে ফাঁসী কাষ্ঠে না ঝুলে চাকরী মিলে যায়?

উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করি,– কি রকম?

কেনারাম চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল : তবে শোন্। প্রাণবল্লভ সেনকে আমি খুন করব ঠিক ক'রেছিলাম—

কথাটা শুনে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম!– সে কিরে, প্রাণ-বল্লভ সেন যে তোর দাদামশাই– মার আপন মামা!

: দুত্তোর আপন মামা—কেনাই অতি অবজ্ঞাভরে উত্তর করল : ওর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর এমন দিনও আমার গিয়েছে যেদিন এক মুঠো অন্ন পর্যন্ত জোটেনি!

: বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল!—কৈ সে সব তো শুনিনি কিছু!

: কি ক'রে শুনবি? তোরা ভালো ছেলের দল, কেবল সম্মুখেই তোদের দৃষ্টি। পেছনে যে এক ক্লাশে তিন বছর প'চে মরল, তার দিকে তাকাস তোরা কোন দিন?

কথাটি হয়ত মিথ্যাও নয়। সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, — তা, তাড়ালো কেন?

: কি জানি!—তবে হাঁ, দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার ওর তামাক সেজে, পুঁথির বিদ্যা থেকে ধূমপানের বিদ্যাতেই আমি পারদর্শী হ'য়ে ছিলাম বেশি। অস্বীকার করব না ভাই তোর কাছে,—

বিদ্যেটা আমি ওরই ছেলেদের মধ্যে একটু বেশি ক'রে বিতরণ করবার চেষ্টা করেছিলাম।

: তারপর ?

: তারপর ফুটবলের মাঠে এবং পথে ঘাটে দু-চারটে মাথা ফাটার ব্যাপারে আমাকে সংশ্লিষ্ট দেখে দুর্জন ব'লে তিনি করলেন আমায় পরিহার।

: খুনের কথা কি বলছিলি ?

: হ্যাঁ, প্রাণবল্লভের প্রচুর টাকা আছে এবং তিনি আমার মায়ের প্রত্যক্ষ মামা এই অপরাধে আর পরিচিত মহল থেকে আমি কোন সাহায্যই পেলাম না! দু-একটা জায়গায় কিছু টাকা জামিন দিতে পারলে চাকরী হয়ত মিলত ; কিন্তু দাদুর কাছে সে প্রস্তাব করতেই তিনি কোলা ব্যাংয়ের মত ডাক ছেড়ে উঠলেন আর প্রতিজ্ঞা করলেন,—জীবনে তিনি আমার মুখ দর্শন করবেন না! অথচ আমার মায়ের সমস্ত গহনাই জমা ছিল ঐ প্রাণবল্লভের কাছে। একমাত্র মামা ছাড়া মার তো আপন বলতে কেউই ছিল না।

মরিয়া হয়ে গেলাম ভাই! মনে হ'ল, লেখাপড়া যে বেশি শিখতে পারিনি তার একমাত্র কারণ ঐ প্রাণবল্লভ। পাটের দালালী ক'রে টাকার কুমীর হ'য়ে ব'সে আছে লোকটা।

প্রাণবল্লভের তখন গোপনে চলছে সুদে টাকা খাটানোর লগ্নী কারবার, আর সদরে চলছে ভড়ং গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর পরনে রক্তাম্বর! 'শিব-শংকরী' ছাড়া কথা বলে না আর 'তারা দীনতারিণী' ছাড়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে না!

হ্যাঁ, চাকরী একটা প্রায় জুটেছিল,—এক ব্যবসায়ীর ওখানে থাকা আর তার ইটের পাঁজার খবরদারী করা ; কিন্তু প্রাণবল্লভ এমন এক চিঠি লিখে দিল সেখানে—যাতে চাকরী তো দূরের কথা, আশ্রয়টা পর্যন্ত তারা দিল না।

স্থির করলাম, প্রাণবল্লভের প্রাণসংহার ক'রে এবার আমি ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলব।

রাত্রিবেলা একটা মোটা লাঠি নিয়ে লুকিয়ে রইলাম প্রাণ-বল্লভের ঘরের পিছনের দরজার পাশে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। এই পথেই প্রাণবল্লভ রাত্রিবেলায় প্রয়োজন হ'লে বাইরে আসে।

কী মশারে বাবা,—যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমায়! জোরে চড়-চাপড়ও মারতে পারছি না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশার কামড় খাচ্ছি। কিন্তু খুন চেপেছে আমার তখন—হয় এসপার না হয় ওসপার।

গভীর রাত্রি। খুব আস্তে দরজাটা খুলে গেল। লাঠিটা উঁচিয়ে রইলাম। তারা, শিব-শংকরী—দেখে যাও তোমার ভণ্ড ভক্তের অবস্থা আজ।

পরমুহূর্তেই সেই উদ্যত লাঠি গিয়ে পড়ল—প্রাণবল্লভের মাথায়! মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন তিনি—সঙ্গে সঙ্গে আর এক লাঠির প্রচণ্ড আঘাত। একটা করুণ আর্তনাদ ক'রে মাটিতে প'ড়ে গেলেন প্রাণবল্লভ।

কিন্তু আমার ছুটে পালাবার আগেই স্বয়ং প্রাণবল্লভই চিৎকার করে উঠল ঘরের ভিতর থেকে। তখনই আর একটি লোক একলাফে দরজার বাইরে এসে দে ছুট।

কেমন হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলাম আমি। চারদিক থেকে লোকজন আলো নিয়ে ছুটে এল। সকলে দেখল, সিঁদ কেটেছে প্রাণবল্লভের ঘরে। আমি লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আর কালো রংয়ের হাফ প্যাণ্ট পরা চোর—যাকে আমি প্রাণবল্লভ মনে ক'রে ভুল করেছিলাম, সে মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে এক পাশে—মাথা দিয়ে তার রক্ত ঝরছে।

সকলে এসে তার হাত-পা বেঁধে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। তার কোমরে ছিল একটা ঝক্‌ঝকে ছোরা।

বেচারীর জন্য দুঃখ হ'ল আমার। আহা! লোকটি তো আমার উপকারই করতে এসেছিল। এতদিন কোথায় ছিলে ভাই? ঠিক ঠিক আজকের রাতটিতে আমিই বা কেন এসেছিলাম মরতে। বন্ধু আমার, আমাকে কেন সঙ্গে নিলে না, আমি কোথায় কি আছে সবই তো দেখিয়ে দিতে পারতাম। তোমরা দু'জন প্রাণবল্লভের যথা সর্বস্ব নিয়ে তার ভুঁড়ি ফাসিয়ে দিয়ে কেন পালালে না। হায়, হায়! কিসের থেকে কি হয়ে গেল। চোরের গলা জড়িয়ে ধ'রে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করল।

প্রাণবল্লভ আমাকেই এই চুরির ব্যাপারে জড়িয়ে হাজতে পুরতো কিনা জানিনে; কিন্তু তার আগেই চোরটি সকলের সামনে আপসোস ক'রে বল্ল—কি করব, সুমুখে তোমায় দেখতে পেলে কি আর ছাড়তাম? অন্ধকারে লুকিয়ে পিছন থেকে লাঠি চালালে—তা'না হ'লে—

সুতরাং আমার দুর্জয় সৎ সাহস আর বীরত্বের কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়ল চার দিকে।

থানায় এসেছিলেন এস. পি.। তিনি সব শুনে আর আমার চেহারা দেখে ডেকে বল'লেন,—চাকরী করবে পুলিশে? মনে মনে ভাবলাম, দেয় কে?

তারপর হ'য়ে গেলাম কনেস্টবল।

: কিন্তু এত শিগ্‌গির দারোগা হলি কি করে তাই বল্—আমি উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

: সেও ডিস্‌মিস্ হ'তে গিয়ে প্রমোশন।

: বলিস কি!—অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করি। সব কথা খুলে বল দেখি!

: কালীগঞ্জের জমিদার দরখাস্ত পাঠাতে লাগল,—মাছ চুরি হ'চ্ছে তাঁর পুকুরে প্রায় রোজ রাতেই। বড় বাবু আমাকে বললেন, দেখ তো কেনারাম কিছু ব্যবস্থা করতে পার কিনা, বড় জ্বালাতন করল তো এই লোকটি।

গেলাম কালীগঞ্জে।

সকালে দেখি, একটা লোক মাছের ঝাঁকা মাথায় ক'রে ছুটছে। সে যাবে কালীগঞ্জ বাজারে। নামালাম তার ঝাঁকা। দুই দুটো ইয়া বড় রুই। বললাম,—তুই মাছ চুরি ক'রে পালাচ্ছিস? লোকটি তো শুনে অবাক। বলল, সেকি! চুরি করব কেন? বললাম, চুরিই যদি না করবি তাহ'লে অমন হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটছিস কেন?

লোকটা আরও অবাক হ'য়ে গেল।—সেকি! এমন তো আমরা রোজই ছুটি!

তা হ'লে রোজ রাত্রেই চুরি করিস। জমিদার বাবু তো সেই কথাই লিখেছেন। গাঁয়ের লোক জমা হল। তারাও বলল, সত্যই জমাদার সাহেব, লোকটা চোরই হয় তো হবে। দশচক্রে ভগবানও নাকি ভূত হ'য়েছিলেন, মানুষ তো কোন ছার! সাক্ষী, জমিদারের সেই সব চিঠি সমস্ত ঠিকঠাক ক'রে চোর নিয়ে রওনা দিলাম। সন্ধ্যায় এল প্রচণ্ড ঝড় জল। বাধ্য হ'য়ে এক জায়গায় আশ্রয় নিতে হ'ল।

কিন্তু লোকটি ছিল সৎ; চোর নয়। সে দেখল পুলিশে ছুঁলে রক্ষা নেই। রাত্রি বেলায় তার মাছের ঝাঁকা ফেলে হঠাৎ সে দিল চম্পট!

আমি পড়ে গেলাম মুস্কলে। সবাই জানে চোর ধরা পড়েছে—থানায় পর্যন্ত খবর চলে গেছে, এখন চোর পালালে যে চাকরী বাঁচানোই দায় হবে—নির্ঘাৎ ডিস্‌মিস্‌।

বেরিয়ে পড়লাম। দেখি বিল থেকে একটি লোক গজাল মাছ ধরে ফিরছে। খুব গরিব। বললাম, কাজ করবে? জিজ্ঞাসা করল, কি কাজ? বললাম, একটা মাছের ঝাঁকা নিয়ে যেতে হবে সদরে, থানায় বড়বাবুর বাসায়। বকশিস পাবে।

লোকটি রাজী হ'য়ে গেল।

বললাম তোমার গজাল মাছ আমি নেবো। বাড়িতে এই টাকা পাঁচটা দিয়ে এস। দিন তিনেক তোমার দেরি হবে ফিরতে, বলে এসো।

থানায় নিয়ে কচুবন ক টতে লাগিয়ে দিলাম তাকে। রুই মাছ দুটো গেল বড় বাবু আর ছোট বাবুর বাসায়।

যথা সময়ে সেই গজাল মাছ আর সেই লোকটিকে নিয়ে কোর্টে উপস্থিত হলাম। হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি মাছ ধরেছ?

: আজ্ঞে হাঁ।

: কখন ধরেছ?

: রাত্রে।

: জমাদার সাহেব তোমায় কোথায় ধরল?

: আজ্ঞে মাঠের মধ্যে।

: কেন এভাবে তোমরা মাছ ধর?

: আজ্ঞে গরিব মানুষ—

: কি মাছ ধরেছ?

: গজাল মাছ

: ওর দাম কত হবে?

একজন মাছটা উঁচু করে ধরল। মোক্তার বাবু বললেন দেড় টাকার বেশি হবে না হুজুর। হাকিম তাকে ভবিষ্যতে এ ভাবে মাছ ধরতে নিষেধ করে দু'টাকা জরিমানা করলেন। আমি জরিমানার টাকা জমা দিয়ে তাকে খালাস করে নিয়ে এলাম।

এমন হাতে-নাতে মাছ-চোর ধরার জন্য আমার দিন কয়েকের মধ্যেই প্রমোশন হয়ে গেল।